অচিন্ত্য পূর্ণিমা

সৈয়দ শামসুল হক

BENGALIEBOOK.COM
BE
বেঙ্গলিবুক.কম
bengaliebook.com
বেঙ্গলিবুক.কম
বেঙ্গলিবুক.কম
bengaliebook.com
বেঙ্গলিবুক.কম
★2022★

সূচিপত্র

১. আজকাল কত সুবিধে 2
২. ভোরে উঠে দেখে প্ল্যাটফরমে 34
৩. ডিস্পোরীটা পছন্দ হয়েছে ইদ্রিসের 53
৪. শীত পড়তে শুরু করেছে 67

১. আজকাল কত সুবিধে

আজকাল কত সুবিধে। তিস্তা থেকে মিটার গেজ লাইন বেরিয়ে গেছে। সকালে একটা আর রাতে একটা লোক্যাল ছাড়ে। চলে যাও সোজা শেষ স্টেশন কুড়িগ্রাম পর্যন্ত। স্টেশনের পরেই। নদী। খেয়া পেরোও। পেরিয়ে বাস। বাস একেবারে পতিদহ পর্যন্ত যায়। ব্যাস, পৌঁছে গেলে গন্তব্যে।

কিন্তু তখন এ সব কিছুই ছিল না। মার্টিন কোম্পানির লাইট রেলওয়ে ছিল বটে কুড়িগ্রাম অবধি, কিন্তু তার সময়সূচি বলতে কিছু ছিল না। যাত্রীতে বগি ভরে উঠলে গাড়ি ছাড়ত, নইলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। বংশ গরিমায় আর ধনের মহিমায় যারা টগবগ করত তারা নাইট ট্রেনে চড়তেন না। নাক সিটকোতেন। তাদের জন্যে পালকি আসত, বেহারা আসত, তাজি ঘোড়া মওজুদ থাকত।

তিস্তা তখন দার্জিলিং মেলের পথে ছোট্ট একটা স্টেশন মাত্র। তিস্তা নদীর ব্রীজ পেরোবার আগে একটা লম্বা সিটি দিতে হয় মাত্র। স্টেশন মাস্টার রাতে হলে সবুজ বাতি দেখান, দিনে ছেঁড়া নিশান। এক ঝলক উদ্দাম স্বপ্নের মতো হুহু করে বেরিয়ে যায় কলকাতার গাড়ি, আসামের গাড়ি।

তবে হ্যাঁ, প্ল্যাটফরমের দুই মাথায় যে দুটো বুড়ো শিমুল গাছ এখনো দেখা যায়, দেখা যায় মৌসুমের সময় আগুন রং ফুলের কিরীট পরে থাকতে, সে গাছ দুটো তখনো ছিল।

একেবারে এইটুকুন। কাটিহারের কোন্ এক ঘরবিরহী কুলি সর্দার শখ করে লাগিয়েছিল চারা দুটো।

সেই সেদিনের তিস্তায় এসে নাবলেন ইদ্রিস ডাক্তার আর পতিদহের বড় তরফ হাজি জয়েনউদ্দিন।

স্টেশন ঘরের সামনে টিমটিম করে বাতি জ্বলছে কাঁচের ডডামের ভেতর। তাতে স্টেশনের নাম লেখা। পেছনে বাঁশের জঙ্গল থেকে শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। যেন মহোৎসব লেগে গেছে তাদের রাজত্বে। চারিদিকে জনমনিষ্যির সাড়া শব্দ নেই।

পার্বতীপুরে মিটার গেজ গাড়িতে চড়বার পর থেকে দুজনের মধ্যে প্রায় কোনো কথাই হয়নি। এবারে গলা সাফ করে ইদ্রিস ডাক্তার বলল, এই বুঝি তিস্তা?

হা, সন্ধ্যে হয়েছে। নইলে নদীটাও দেখতে পেতেন। বর্ষার সময় ভীষণ মূর্তি হয়ে ওঠে। তাই নাকি?

নিজের কাছেই নিজের গলার স্বর কেমন অদ্ভুত ঘরঘরে শোনায়। ইদ্রিস ডাক্তার আবার গলা সাফ করে। সেটা লক্ষ্য করে হাজি সাহেব আবার বলেন, ইচ্ছে করলে এখনো ফিরে যেতে পারেন। রাত দুটোয় একটা ফিরতি ট্রেন আছে।

কোথায়?

কেন, কলকাতায়। ইচ্ছে করলে সিরাজগঞ্জেও যেতে পারবেন। সেখানেই আপনার দেশ বলেছিলেন না?

হ্যাঁ।

যাবেন ফিরে?

স্টেশন ঘরের বাতিতে ইদ্রিস ডাক্তারের ঘন শ্যামল মুখটা স্পষ্ট দেখা যায়। লজ্জিত হয়ে হাসে সে একবার। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, ফেরৎ যাবার কথা ভাবলে তো আর বেরুতামই না।

তবু

তবু কী?

বলছিলাম, এখনো ভেবে দেখতে পারেন। ছিলেন কলকাতায়। সে এক বিরাট শহর। আপনার মতো লোকের একটা না একটা রুজি হয়েই যেত সেখানে। তাছাড়া আপনার প্রিন্সিপ্যাল সাহেবও খুব স্নেহ করে আপনাকে। আপনি চাইলে তিনি আপনার ভালো ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন কলকাতায়।

সে আমি জানি।

আর ভেবে দেখুন পতিদহ এক গগ্রাম। এখান থেকে ঝাড়া পঞ্চাশ মাইল। বর্ষা শুরু হলে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। থিয়েটার বায়োস্কাপ নেই। গড়ের মাঠের হল্লোড় নেই। রোশনি নেই। মন টিকবে পতিদহে?

কেন একথা জিজ্ঞেস করছেন বারবার?

এই জন্যে করছি, আপনার মতো শহুরে লোক হুট করে পতিদহের দাঁতব্য ডিস্পেন্সারীতে ডাক্তারী নিতে চাইবে, আমার যেন ভালো করে বিশ্বাস হতে চায় না। আমি যখন ডাক্তারের খোঁজে কলকাতা গিয়ে আপনার প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করলাম তখন এক রকম ধরেই নিয়েছিলাম কেউ রাজি হবে না আসতে।

সে ভুল তো আপনার ভেঙেছে।

হ্যাঁ, তা ভেঙেছে। সেই জন্যেই আরেকবার ভাবতে বলছি। কী জানেন, আমি সবসময়ই খোলামেলা কথা পছন্দ করি। কারো ওপরে জোর করি না। নিজেই ভালো করে জানি, পতিদহে কী আছে? পতিদহে কেন আপনার মতো শিক্ষিত মানুষ যাবে? ক টাকাই বা মাইনে দেব?

আচ্ছা, সে কথা এখন থাক।

ইদ্রিস ডাক্তার থামিয়ে দিল হাজি সাহেবকে। একটু পর বলল, রাতেই কি রওয়ানা দেবেন?

না, এখানে রাতটা কাটিয়ে ভোর বেলায়

পতিদহের বড় তরফ হাজি জয়েনউদ্দিন মাথা দুলিয়ে দাড়ি খেলাল করলেন বার কয়েক। বললেন, পাগল হয়েছেন? এই রাতে রওয়ানা দিতে চান?

ক্ষতি কী?

এটা কলকাতার রাজপথ নয় ডাক্তার সাহেব। সিঙারদাবড়ি হাটের পর থেকে বন শুরু হয়েছে। সে বনে বাঘও আছে বলে লোকে বলে। আমি দেখিনি নিজে। বাঘের মুখে। উৎসাহের তোড়ে প্রাণ দেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

ও।

হাজি সাহেবের সঙ্গে এসেছে দুই খানসামা আর এক পাইক। তারা ততক্ষণে স্টেশনের বিশ্রাম ঘর খুলিয়ে বিছানা করে ফেলেছে। রাতের রান্নার যোগাড় দেখছে এখন তারা। একজন বাজারে বেরিয়ে গেছে চাল ডাল কিনতে।

ইদ্রিস ডাক্তার সব শুনে বলল, আমি তাহলে একটু হেঁটে আসি।

রাতে আবার কোথায় হাঁটতে যাবেন ডাক্তার?

প্ল্যাটফরমেহ।

দেরি করবেন না। শীত পড়তে শুরু করেছে। মাথায় হিম বসে গেলে শরীর খারাপ করবে। কথাটা ইদ্রিসের মনে প্রবল নাড়া দেয়। এক মুহূর্তের জন্য অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে সে। এরকম করে কত বছর কেউ তাকে কথা বলেনি। শুনে যেন চমকে উঠতে হয়। ইদ্রিস ডাক্তার ইতস্তত করে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে এসে নুড়ি বিছানো রুক্ষ প্ল্যাটফরমের ওপর জমাট অন্ধকারের ভেতর আনমনে হাঁটতে থাকে। মাথায় হাত দিয়ে দেখে হিম পড়ছে সত্যি সত্যি।

কাল দুপুরের কথাগুলো আবার ভিড় করে আসে তার মনে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বৌবাজারের ডিস্পেন্সারীতে বসে তখন রোগী দেখছিল সে। এমন সময় চাকর এসে খবর দিল দুপুরে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বাসায় ডেকেছেন খেতে।

এ রকম তো কত দিন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ডেকেছেন। তাঁর হোমিওপ্যাথিক কলেজে পড়াশোনা করেছে ইদ্রিস। ইচ্ছে ছিল, কলকাতায় এসেছিল সে, এলোপ্যাথি পড়বে বলে। ক্যামবেল পাশ ডাক্তার হবে বলে। কিন্তু এক বছর পড়বার পড় সামথ্যে আর কুলোলো না। বাবার এন্তেকালের পর বড় ভাই সংসার দেখতে এগিয়ে এলেন না। তিনি তখন মহম্মদী হয়েছেন। লম্বা লম্বা চুল রাখেন, চোখে দেন সুরমা, মাথায় বিরাট সাদা পাগড়ি বাঁধেন। চেহারা ছিল এমনিতেই নুরানি। এই লেবাসে মনে হতো বড় ভাইকে যেন ইরান তুরানের বাদশাহর ছেলে স্বপ্নাদেশে ফকিরি নিয়ে পথে বেরিয়েছে। ঘর–ছাড়া বড় ভাই মাঝে মাঝে ঘরে আসতেন টাকার জন্যে। বাবার কাছে তা পাওয়া যেত না। রাত দুপুরে বাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় মাকে ডাকতেন। মা বেরিয়ে এসে আঁচল আড়াল দিয়ে তাকে রান্নাঘরে বসিয়ে খেতে দিতেন। ঘুমন্ত স্বামীর বালিশের নিচ থেকে চাবি চুরি করে টাকা বের করে দিতেন। বড় ভাই সেই রাতেই গ্রাম ছেড়ে আবার চলে যেতেন মাস

দুমাসের জন্যে। কোথায় কোন সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে থাকতেন, কোন মাজারে বসে জেকের করতেন, হানাফিদের সঙ্গে বিবাদ পাকিয়ে তুলতেন তার সঠিক খবর কেউ জানতো না।

বাবা মারা যাবার পরও সে আদত গেল না বড় ভাইয়ের। সংসার ভেঙ্গে পড়তে লাগল। মার পক্ষে সম্ভব হলো না সব জমিজমা থেকে ধান আদায় করা, তার বিলি বন্দোবস্ত করা। গাছের আম–কাঁঠাল পাড়া পড়শি পেড়ে খেতে লাগল, চুরি হতে শুরু করল, মা কিছু করতে পারলেন না। ঘরে এক সোমত্ত মেয়ে আর তিনি, আর তো কোনো ব্যাটা ছেলে নেই। বড় ভাইকে কতবার বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন মা, তবু তিনি ফিরলেন না। মা বললেন, বাবা তোর ফকিরি করতে হয়, জেকের করতে হয়, বাহাস করতে হয় ভিটেয় এসে কর। কেউ তোকে বাধা দেবে না। তোর বাবা তুই মুহম্মদী হয়েছিস বলে বাড়িতে উঠতে না দিলেও আমি কিছু বলব না। তুই যেমন চাস তেমনি হবে।

কিন্তু বড় ভাইর মনে যেন তখন ঘোর লেগেছে। কঠিন হাতে মার বাড়ানো হাত সরিয়ে দিয়ে বলতেন, সংসারের লোভ আমাকে দেখিও না মা। যে সংসারের সন্ধান আমি পেয়েছি তার খবর তুমি কী জানো?

ভণ্ড, পাষাণ্ড! ইদ্রিস ডাক্তার দাতে দাঁত চেপে তিস্তার প্ল্যাটফরমে হাঁটতে হাঁটতে উচ্চারণ করল। বলল, তাই যদি হবে তাহলে অনাথা মায়ের কাছে হাত পাততে আসিস কোন লজ্জায়? ফকিরের আবার টাকার দরকার কী? এত যে আল্লাবিল্লা করিস তাও তো আকাশ কুঁড়ে টাকার বৃষ্টি হয় না। টাকার জন্যে তো সেই সংসারেই আসতে হয়। ভণ্ড কোথাকার। নিজের সঙ্গেই এতগুলো কথা বলবার পর ভেতরের উত্তেজনা খানিকটা কমে এলো ইদ্রিসের। মা টাকা পাঠাতে পারেনি বলে যে এলোপ্যাথি পড়তে সে পারেনি তার

জন্যে মনটা তেতো হয়ে গেল না আবার। কেমন মমতায় ভরে উঠল বুকটা। এমনকি বড় ভাইয়ের জন্যেও একটু টনটন করে উঠল শরীরের ভেতরে কেথায় যেন।

একবার তো সে ভেবেছিল নাম যখন ক্যামবেল থেকে কাটাই গেল মাইনে আর মেস ভাড়ার অভাবে। সে ফিরে যাবে সিরাজগঞ্জে, তার গণ্ড গ্রামে। সংসার দেখবে। বোনটাকে বিয়ে দেবে। মার সেবাযত্ন করবে। শেষ বয়সে মা যেন একটু শান্তিতে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করবে। আর তার নিজের ভবিষ্যৎ? হোক না, যা কপালে লেখা আছে, তাই হোক। হালচাষ নিয়ে থাকতে খুব যদি খারাপ লাগে তো গাঁয়ের মকতবে মাস্টারি করবে। মাস্টারি করাটাও একটা বড় কাজ।

আসলে সারাজীবন সে একটা কিছু করতে চেয়েছে, বড় একটা কিছু। কিন্তু সেই বড় কাজটা কী, তা নিজেও কোনদিন ভালো করে বুঝে উঠতে পারে নি। বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষ কেউ ইংরেজি পড়েনি। সে জেদ করে, বাবার সঙ্গে বিস্তর ঝোলাঝুলি, কাদাকাটি করে চৌবাড়ির স্কুলে ইংরেজি পড়তে গিয়েছে। পরীক্ষায় ভালো ফল করার দরুণ বাড়ি এসে চৌবাড়ির সেকেণ্ড টিচার যখন বাবাকে বলে গিয়েছিলেন, আপনার ছেলেটা লেখাপড়া শিখলে কালে একজন মানুষ হবে, তখন সেই প্রশংসা শুনে বাবার মনটাও বেশ নরোম হয়ে গিয়েছিল।

শুধু সে নিজে ভর্তি হয়েই ক্ষান্ত হয় নি। বড় ভাই পড়তেন মকতবে, তাকেও বুঝিয়ে শুনিয়ে ইংরেজি স্কুলে টেনে নিয়ে এসেছিলেন। তখন বড় ভাই তার কথা শুনতেন। তখন বড় ভাই ইদ্রিস ছাড়া কাউকে বুঝতেন না।

সেই ছেলেবেলাতেই ইদ্রিস স্বপ্ন দেখত, দুভাই তারা ইংরেজি পড়ে মস্ত বড় হয়ে গেছে। দেশের লোক হাটমাঠ ভেঙ্গে আসছে তাদের দেখতে। জেলার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট খাস হুকুমবরদার পাঠাচ্ছেন বড় চাকরির পয়গাম দিয়ে। ইদ্রিস কল্পনায় দেখতে পেত কলকাতাকে বুড়ি দাদির কিস্সায় শোনা বাগদাদ দামেস্কের মতো ঝলমলে, মণিমুক্তো পথে পথে ছড়ানো, রং বেরংয়ের রোশনাই জ্বলা, বাদ্য বাজনায় ডগমগ করতে থাকা কলকাতা। সেই কলকাতায় যাবে তারা।

তা হলো অন্যরকম। সেকেণ্ড ক্লাশে পড়তে পড়তে বড় ভাই মহম্মদী হয়ে গেলেন। কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল তা জানতেও পারল না ইদ্রিস। তবে কানাঘুষোয় শুনেছিল শাজাদপুরের কোন এক জেলার মেয়ের রূপ নাকি তাঁকে টেনেছিল। তারা ছিল মহম্মদী। বড় ভাইও তাই হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়েটা কেন হয়নি তা ইদ্রিস শত চেষ্টা করেও জানতে পারে নি। তাছাড়া তখন চলছিল তার এন্ট্রান্স পাশের পড়া। দম নেবার ফুরসৎ ছিল না। বলতে গেলে।

পাশ করেছিল ভালোভাবে, কলকাতায় গিয়াছিল ডাক্তারী পড়তে। চৌবাড়িতে একবার কঠিন অসুখ হয়েছিল তার। বড় ভাই যে বাড়িতে জায়গির থাকতেন সে বাড়ির মিয়া সাহেব দয়াপরবশ হয়ে টাকা খরচ করে ডাক্তার আনিয়েছিলেন। সেই ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে ভালো হয়েছিল ইদ্রিস।

ভারী ভালো লেগেছিল ডাক্তারকে তার। লম্বা নল দিয়ে বুক পরীক্ষা করছেন। চোখ কপালে তুলে জিভ একটু বের করে নাড়ি টিপে দেখছেন। খসখস করে লিখে দিচ্ছেন

ব্যবস্থা। মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল সেই ছবিগুলো। আজরাইলের সঙ্গে লড়াই করা সে কি সহজ!

ইদ্রিসের যেন মনে হয়েছিল, লেখাপড়া শিখে যদি কিছু হতে হয় তো ডাক্তার হবে সে। আজরাইলকে কাবু করার ফন্দি সন্ধি জানার চেয়ে চূড়ান্ত আর কী দিতে পারে ইংরেজি শিক্ষা? সে ডাক্তার হবে।

বাবা এন্তেকাল করার পর টাকার অভাবে যখন তার পড়াশোনা বন্ধ হলো, তখন একবার এক ঝলক মনে হয়েছিল বেঁচে থেকে কী লাভ? মনে হয়েছিল, এক ফুয়ে কে যেন বিরাট এক ঝলমলে ঝাড়বাতি নিবিয়ে দিল। কলকাতার ব্যস্ত রাজপথে চলমান মানুষগুলোকে তার মনে হয়েছিল অন্য জগতের মানুষ, কত সুখী তারা, কত সজীব, পায়ের নিচে শক্ত মাটি তাদের। আর একমাত্র সে–ই এদের মধ্যে দলছুট। তার মনে হচ্ছিল যেন, রাস্তার লোকেরাও তা জেনে গেছে; তাকে ভারী অদ্ভুত আর বেখাপ্পা দেখাচ্ছে সবার ভেতরে। এখুনি যেন সবাই হা হা করে হেসে উঠবে।

দুহাতে মুখ ঢেকে দৌড় দিতে যাবে, এমন সময় চোখের সম্মুখে এক দৃশ্য চোখে পড়ল। দেখল কয়েকজন যুবক একটা দরোজা দিয়ে সার বেধে বেরিয়ে আসছে। হাতে তাদের বই খাতা। দরোজার ওপরে সবুজ সাইনবোর্ড। তাতে সূর্যোদয়ের ছবি আঁকা। সেই সূর্যের ওপরে আধখানা বৃত্তের আকারে লেখা প্রিন্সিপ্যাল খানস সানরাইজ হোমিও কলেজ। তার নিচে লাল কালিতে লেখা দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়।

আল্লাহরই কুদরত বলতে হবে। নইলে এই বৌবাজার দিয়ে কত কত দিন সে গিয়েছে, কিন্তু কই, আগে তো এ সাইনবোর্ড চোখে পড়েনি। ঐ যে বড় বড় করে লেখা দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়—-লেখাটা টকটক করছে; এত বড় লাগছে যে তার রীতিমত বিস্ময় হয় সে কি তবে এতকাল চোখ বুজে পথ চলত?

সোজা সে ঢুকে গিয়েছিল দরোজা দিয়ে। প্রিন্সিপ্যাল খান তখন ক্লাস ছুটি দিয়ে ডিস্পেন্সারীতে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী চাই তোমার?

গরিব আর মেধাবী ছাত্রদের কী সুবিধা দেওয়া হয় তাই জানতে এসেছি। সালাম না আদাব না, কোনো ভনিতা নয়, এমনকি দ্বিধা বা ভয়ও নয়—- একেবারে সরাসরি এ রকম প্রশ্ন ডাঃ খান আগে শোনেন নি। স্মিত হেসে বললেন, তুমি পড়তে চাও?

জানি না।

অবাক হয়ে এক মুহূর্তের জন্য ঐ তুললেন ডাঃ খান। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ি কোথায়?

সিরাজগঞ্জ।

কী পাশ করেছ?

এন্ট্রান্স।

কলকাতায় কদ্দিন আছো?

দুবছর।

এসো আমার সঙ্গে। ডিস্পেন্সারীতে তিনি নিয়ে গেলেন ইদ্রিসকে। বাইরে তখন বেশ কয়েকজন রোগী অপেক্ষা করছে। খাস কামরায় ঢুকে ইদ্রিসকে একটা টুল দেখিয়ে বললেন, বোসো এখানে।

অভিভূতের মতো বসলো ইদ্রিস। তার সঙ্গে আর একটি কথাও বললেন না ডাঃ খান। রোগী দেখে চললেন একের পর এক। একজন জিজ্ঞেস করল, ভিজিট কত দিতে হবে? ডাঃ খান হেসে বললেন, ভিজিট তো বাড়ি না গেলে নিই না। ওষুধের দাম দিলেই হবে।

রোগী যেন আর শেষ হতে চায় না। বেলা পাঁচের ঘরে এসে পৌঁচেছে। ইদ্রিসের এক সময় যেন সব অবাস্তব বলে মনে হলো। মনে হলো সে এখানে কেন? কী করছে? কোথা থেকে এসেছে? নিজের নামটাও যেন আরেকজনের নাম বলে মনে হতে লাগল তার কাছে। এই তো সে কাল রাতেও ভাবছিল দেশে ফিরে যাবে সংসার দেখবে, বোনটাকে বিয়ে দেবে, মকতবে মাস্টারী করবে। আজ, এখন, এই মুহূর্তে মনে হলো তার, সে সিদ্ধান্ত আর কেউ নিয়েছিল। কেন সে নিজেকে নষ্ট করবে এভাবে? বড় ভাই যদি সংসার না দেখে পার পেয়ে যান তো সে-ই বা কেন পার পাবে না? ছোট হয়ে তারই বা কী এমন দায়িত্ব! আর সে যদি গাঁয়ে ফিরেই যায় তো সংসারের তাতে লাভ হবে কতটুকু? মা না খেয়ে থাকবেন না, সে না গেলেও। বোনটার বিয়ে সে কলকাতা থেকে গিয়েও দিয়ে আসতে পারবে। শুধু ক-টা বছর। এই বছর ক-টা দাঁতে দাঁত চেপে কোন মতে পার করে দিতে পারলেই তার আবাল্য সেই স্বপ্ন সফল হতে পারে, সে

ডাক্তার হতে পারে। লোকে হয়ত এ কবছর বলবে, বড় ভাই না হয় ফকির হয়ে গেছে, তুই তো বুড়ি মা আর বোনকে দেখতে পারতিস! তা ডাক্তার হয়ে সে যখন গাঁয়ে ফিরে যাবে তখন—

চমক ভাঙ্গলো ডাঃ খানের কথায়। তিনি বললেন, খাও। তাকিয়ে দেখে গরম জিলিপি পিরিচে করে রাখা। আর ঠাণ্ডা দু গেলাশ পানি। ইতস্তত করল সে। ডাঃ খান বললেন, খাও। আমিও নিচ্ছি।

তবু ইতস্তত করছে দেখে তিনি আবার যোগ করলেন, আহা, তোমার জন্য বিশেষ করে আনাই নি। ক্লাশ শেষে রোগী দেখে এটুকু নাস্তা করি। নাও।

সে একটা জিলিপি নিল। বাবার কথা মনে গড়ে গেল তার। চৌবাড়িতে সে যখন পড়ত বাবা মাঝে মাঝে দেখতে আসতেন। হাতে থাকত খাবারের পুটুলি। রাগ করে সে বলত, কেন আপনি এ সব বয়ে নিয়ে আসেন। বাবা হাসতেন। পরে করতেন কী, খাবার আনতেন ঠিকই; কিন্তু বলতেন না যে তার জন্যে আনা। বলতেন, তোর মা আমারই নাস্তার জন্যে সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল, তা তুইও খা আমিও খাই।

পানি খেতে খেতে ইদ্রিস ভাবল, না হয় নাই এলো এলোপ্যাথি পড়া। হোমিওপ্যাথিই বা মন্দ কী। দামে শস্তা। খেতেও ভালো। কোনো বদ ক্রিয়া করে না। দেশ গায়ের লোকেরা দুবেলা পেট পুরে খেতে পায় না। এলোপ্যাথির পয়সা জোগাবে তারা কোত্থেকে। হোমিওপ্যাথি শিখলে সবার সেবা করতে পারবে ইদ্রিস। গায়ের অবস্থা তার চেয়ে ভালো

তো আর কেউ জানে না। বরং আল্লার ফজলে এই ভালো হলো। সে হোমিওপ্যাথি পড়বে।

মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো। এ–কী আকাশ কুসুম সে বানাচ্ছে? তার তো কলকাতায় একবেলা থাকবার মতো সঙ্গতি নেই। আজ দেড় দিন পেটে ভাত পড়ে নি। মেসওলা বলে দিয়েছে কাল পর্যন্ত টাকা দিতে না পারলে সে যেন সীট ছেড়ে দেয়। এত সৌভাগ্য কি তার হবে যে সে হোমিওপ্যাথিই পড়তে পারবে? না হয় কিছু সুবিধে করে। দেবেন ডাঃ খান। কিন্তু তাতে তো আর খাওয়া পরার সমস্যা সমাধান হবে না। মনটা একেবারে নিভে যায় ইদ্রিসের। সে মাথা নিচু করে বসে থাকে।

তা কলকাতায় এতদিন কী করছিলে?

ডাঃ খান প্রশ্ন করেন।

ক্যামবেলে পড়তাম।

ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন ডাঃ খান। বললেন, ক্যামবেল?

জ্বি হ্যাঁ।

তারপর?

সব খুলে বলল ইদ্রিস। শুনে ডাঃ খান চোখ বন্ধ করলেন। চেয়ারের পেছনের দুপায়ে শরীরটাকে ঠেলে ভর দিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। রোগী এলো আরেকজন। তখন আবার

সোজা হয়ে বসলেন। সব শুনে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন তার। তারপর ইদ্রিসের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, আমার এখানে যারা পড়ে তারা সবাই প্রায় তোমার মতো। আমার কিছু বাধা রোগীপত্র আছে। তাদের কেউ খানসামা, কেউ রাজমিস্ত্রী, কেউ বই বাঁধানোর বা ছাপাখানার কাজ করে। নিজেরা গরিব হলেও ওরা বাড়িতে থেকে ছেলে পড়িয়ে নিজেরা পড়াশোনা করে। পারবে তুমি?

আগ্রহে দুহাত জড়ো করে উজ্জ্বল চোখে ইদ্রিস উত্তর করে, হ্যাঁ পারবো। খুব পারবো। কিন্তু কলেজের মাইনে?

সেটা? সেটা না হয় তুমি আপাতত নাই দিলে। আমার ডিস্পেন্সারীতে আরেকজন লোক দরকার লেবেল কাটা, শক্তি লেখা, কর্কের মাথায় ব্লকের ছোপ দেবার জন্যে। কিন্তু প্রথম বছরের পরীক্ষায় যদি ফল খারাপ হয় তাহলে এ সুবিধে আর পাবে না। মোট চার বছর পড়তে হবে।

আমি পড়ব স্যার। আমি চেষ্টা করব ভালো ফল করতে স্যার।

প্রথম বছরেই পড়াশোনায় ইদ্রিস এত ভালো করল যে ক্লাশের ভেতরে প্রথম হলো সে। ছকু খানসামা লেনে জায়গির পেয়েছিল। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে বৌবাজার আসতো সকাল নটায়। ক্লাশ করতো। পড়াতেন ডাঃ খান নিজে। আর কোনো প্রফেসর ছিল না কলেজে। নিজেই অর্গানস, ফিজিওলজি, অ্যানাটমি, মেটিরিয়া মিডিকা, প্র্যাকটিস অব মেডিসিন সব সাবজেক্ট পড়াতেন। ক্লাশ শেষে ইদ্রিস গিয়ে বসতো ডিস্পেন্সারীতে। সেখানে সন্ধ্যে পর্যন্ত ওষুধ ঢালা, লেবেল লাগানো, প্যাক করা, পয়সা গুণে রাখা, মেমো

কাটা এই করত সে। সন্ধ্যের পর যখন বাসায় ফিরত প্রায়ই সঙ্গে নিয়ে আসত ডাঃ খানের লেখা বইয়ের পাণ্ডুলিপি। রাত জেগে নকল করে দিত ইদ্রিস। বই ছাপাতেন ডাঃ খান নিজেই। সে বই তার নিজের কলেজেই পাঠ্য ছিল। আর কিনত মফস্বলের মুসলমান হবু হোমিওপ্যাথরা।

এক বছর পরে একদিন ডাঃ খান ইদ্রিসকে ডেকে বললেন, আমার বাসায় তো বাইরের ঘরটা পরেই থাকে। চলো এসো।

মানে স্যার?

গর্ধব কোথাকার। মানে আবার কী? আমার বাসায় থাকবে আজ থেকে।

ডাঃ খানের প্রিয় ছাত্র ইদ্রিস সম্মানের সঙ্গে ফাইন্যাল পাশ করল। ডাঃ খান নিজের খরচে তার ছবি ছাপিয়ে দিলেন সাপ্তাহিক মোহাম্মদী আর শিক্ষা–সমাচারে। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে ইদ্রিস বিদায় নিল। ফিরে এলো তার গায়ে। ততদিনে বড় ভাই মহম্মদী নাম ঘুচিয়ে আবার হানাফি হয়েছেন। সংসার করছেন। ইদ্রিস ফিরে এলে বললেন, এবার বিয়ে করে সংসারী হ।

সে কেমন করে হয়? বড় ভাই থাকতে ছোট ভাই আগে বিয়ে করবে সে কী কথা?

কিন্তু কিছুতেই তাকে বোঝানো গেল না। আর ইদ্রিসেরও পণ বড় ভাই বিয়ে না করলে সেও বিয়ে করবে না। ইতিমধ্যে বোনের বিয়ে ফরজ হয়ে পড়েছে।

এক বিকেলে কাণ্ড হলো একটা। গায়ে ঘোড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। কে এক দিব্যকান্তি তরুণ ঘোড়ার পিঠে চড়ে ধীরে ধীরে মাঠ ঘাট ভেঙে গাঁয়ের ভেতরে ঢুকেছে।

মকতবের হেড মোদাররেস কাঁপতে লাগলেন থরথর করে। বোধহয় স্কুল ইনেসপেক্টর এসেছে মকতব দেখতে, খাতা দেখতে। কোথায় তাকে বসায়, কী দিয়ে খাতির করে ভেবে না পেয়ে গলদঘর্ম হলেন। নাম জিজ্ঞেস করলেও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন, ধাম জিজ্ঞেস করলে আমতা আমতা করেন।

কিন্তু একটু পরেই হেড মোদাররেস সাহেবের কেমন সন্দেহ হলো। স্কুল ইনেসপেক্টরের মতো রুক্ষ মেজাজ নয়, ধমক দিয়ে কথা বলেন না। খাতাও দেখতে চাইলেন না, এ আবার কে বটে?

তাই বলো শাজাদপুরের উত্তর পাড়ার তালুকদার বাড়ির বড় ছেলে। বাপ মরার পরে গদিতে বসেছেন।

তা হুজুর কী মনে করে? ওরে শরবৎ আন। পাখা আন। হারামজাদাগুলো গেল কোথায়? তালুকদার হাসলেন। বললেন, অনর্থক কেন তালবেলেমদের হারামজাদা বলছেন মৌলবী সাহেব। ব্যস্ত হবেন না। আমি দুদণ্ডের জন্যে এসেছি। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামবও না।

কেন? কেন? হাঁ হাঁ করে উঠলেন হেড মোদাররেস। খাতিরদারিতে কোনো কসুর হবে না। দয়া করে এসে পড়েছেন যখন, বসবেন না, সে কী কথা?

আস্তে আস্তে শোনা গেল সব। তালুকদার সাহেব নিজের জন্যে পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছেন এ গায়ে সে গাঁয়ে। খাঁটি সোনা চান তিনি। রূপে যেন জাহাঙ্গীর বাদশার বেগম মেহেরুন্নিসাকেও হার মানাতে পারে সে মেয়ে। গরিব হোক ক্ষতি নেই। নিচু বংশ হোক পরোয়া নেই। ঘরে বৌ এলে স্বামীর পরিচয়ে পরিচিতা হবে সে। আছে তেমন?

হেড মোদাররেস সাহেব জাফরান রাঙানো দাড়ি ঝাড়লেন বার কয়েক মাথার টুপি হাপরের মতো উঠানামা করিয়ে শীতল করলেন চাঁদি। তারপর হাসিতে বিগলিত হয়ে বললেন, আছে, অবশ্যই আছে। দুবেলা কোরান পড়ান তাকে তিনি। কিন্তু এত কথা তো ঘোড়ায় জিন দিয়ে থাকলে হয় না! নামতে হবে, বসতে হবে, দশ দিক বুঝে শুনে কথা চালাতে হবে।

সেদিন মগরেবের আগেই মেয়ে দেখে পছন্দ করলেন তালুকদার সাহেব। সাতদিনের মাথায় বিয়ে হয়ে গেল। লোকে বলাবলি করল, বাপের ভাগ্য ছিল বটে! নইলে এত বড় ঘরে এ মেয়ে যায়!

ইদ্রিস আর তার ভাই বোনের বিয়েতে খরচ করল সাধ্যাতীত। একমাত্র বোন ছিল সে। চলে যেতেই বাড়িটা যেন খাঁখা করতে লাগল।

মা ধরে বসলেন, এবারে তোরা বউ আন ঘরে। নইলে একবস্ত্রে আমি যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো।

বড় ভাই বললেন, সংসারে মন দিয়েছি বলে মনটা তো সংসারী হয়ে যায় নি। আমি সেই ফকিরই আছি। আমার হুজুর বলেছেন, সংসার সাধনার পথে বাধা। বিয়ে আমি করবো না। মা যদি আত্মত্যাগী হন তো ইদ্রিসের একগুয়েমির জন্যেই হবেন।

অতএব ইদ্রিসকে রাজি হতে হল। পদ্মার ওপারে শিবালয়ের মেয়ে পছন্দ হলো। পছন্দ করে এলেন ওদের বাপের চাচাতো ভাই। দিন–ক্ষণ দেখে ইদ্রিস বড় ভাই আর চাচাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বিয়ে করতে। এখনো মনে আছে ইদ্রিসের বিয়ে করতে বেরুনোর সময় চৌকাঠে হোঁচট খেয়েছিল। মা বললেন, দাঁড়িয়ে যা। ইদ্রিস দাঁড়িয়ে গেল খানিকক্ষণ।

তারপর যে কাণ্ড হলো, ইদ্রিসের মনে পড়লে এখনো গায়ের রক্ত টগবগ করে ওঠে। সে কথা আর কোনদিন ভাবতে চায় না সে। বিয়ে করা নতুন বৌ ফেলে ভোর রাতে কারো মুখদর্শন পর্যন্ত না করে সোজা চলে এলো ডাঃ খানের কাছে।

তিনি তখন ডিস্পেন্সারীতে কেবল এসে বসেছেন। সকাল বেলায় একঘণ্টা বিনি পয়সায় ওষুধ দেয়া হয়। ভিড়ে থইথই করছে এক ফালি বারান্দাটা। ইদ্রিস এসে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে দাঁড়াল।

কী ব্যাপার? ঔষুধ কিনতে এলে? প্রাকটিস কেমন? আছো কেমন? খুশিতে একের পর এক প্রশ্ন করে চললেন ডাঃ খান। এতদিন পরে কৃতি ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যেন আনন্দ আর ধরছে না।

ইদ্রিস বলল, থাকতে এসেছি স্যার।

থাকতে মানে?

আপনার কাছে। যদি জায়গা দেন আপনার ডিস্পেন্সারীতে বসব। যদি যোগ্য মনে করেন কলেজে ছাত্র পড়ানোয় সাহায্য করব। দেশে আর ফিরে যাবো না।

ও।

স্যার, আপনাকে একটা কিছু কথা দিতেই হবে।

আচ্ছা তুমি বোসো তো।

কথা না পেলে বসবো না স্যার।

কী পাগলামো করছ? বোসো বোগী বিদেয় করে নি, পরে তোমার কথা শুনব। উঠেছ কোথায়?

ধমক খেয়ে নরম হয়ে গিয়েছিল ইদ্রিস। বিনীত গলায় উত্তর করল, শেয়ালদা থেকে সোজা এখানে এসেছি।

বেশ করেছে। বাসায় যাও। গোসল করে কিছু খেয়ে নাও। দুপুরে কথা বলব।

ইদ্রিস বহুদিন পরে প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসায় গেল। দেখল, আরেক ছাত্র জায়ণির রয়েছে সেখানে। তার সঙ্গে গল্প করল খানিক। ভেতর থেকে বিবি সাহেবা—-তাকে

আম্মা বলত ইদ্রিস—- সে এসেছে শুনেই নাস্তা পাঠিয়ে দিলেন। ইদ্রিসের মনে হলো অনেকদিন পরে নিজের বাড়িতে যেন ফিরে এসেছে সে।

সেদিন কলেজ ছিল ছুটি : ক্লাশ পড়ানো ছিল না প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের। দুপুরে ইদ্রিসকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসলেন তিনি। বললেন, হ্যাঁ এবার বলো, কী হয়েছে?

পিড়াপিড়ি করেও একবর্ণ বার করতে পারলেন না প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ইদ্রিসের পেট থেকে। সে শুধু এক কথা বলে, আপনার এখানে জায়গা দিন, দেশে আর ফিরে যাবো না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, সে তুমি যতদিন খুশি থাকো এখানে। কিন্তু এভাবে নিজেকে নষ্ট করবে কেন?

নষ্ট করবার কী আছে স্যার? আপনার সঙ্গে প্র্যাকটিস করবো। কলেজ দেখবো।

ফাইন্যাল ইয়ারে যখন পড়ত ইদ্রিস, ডাঃ খান তাকে মাঝে মাঝে নতুন ছেলেদের ক্লাশ নিতে বলতেন। মন ঢেলে পড়াতো সে। আম্মা সাহেবার কাছে একদিন ইদ্রিস শুনেছে, স্যার বলেছেন, চমকার পড়ায় ছেলেটা। সেই প্রশংসার ভরসায় ইদ্রিস কলেজে সাহায্য করার প্রস্তাব দিচ্ছিল বারবার।

প্রিন্সিপাল সাহেবকে হঠাৎ বড় করুণ এবং অসহায় দেখালো। বললেন, তোমার কাছে লুকিয়ে রাখব না ইদ্রিস। কলেজের অবস্থা সুবিধের নয়। আমার বিরুদ্ধে জোর প্রচার।

চালিয়েছে ডাঃ সেন আর ডাঃ চক্রবর্তীর দল। ছাত্র কমে গেছে আমার। এবার মাত্র পাঁচজন ভর্তি হয়েছে।

অবাক হয়ে গেল ইদ্রিস।

সে কী স্যার!

সেন আর চক্রবর্তীর দোষই বা কী দেব? প্রিন্সিপ্যাল সাহেব খেদের ভঙ্গিতে হাতের পিঠ ঘষতে লাগলেন। দোষ আমাদেরই। আমার কলেজে হিন্দু ছেলে পড়তে আসবে এ আশা কোনদিন করিনি। ওদের জাতপ্রীতিটা বড় কঠিন। কিন্তু মুসলমান ছেলেরাও আজকাল কি বলে জানো?

কী স্যার?

বলে, হিন্দুর কলেজে পড়লে ডাক্তার হিসেবে নাম পোক্ত হয়। একে হোমিওপ্যাথি পড়ছি। তাও যদি মুসলমান প্রিন্সিপ্যালের কাছে পড়ি তো আর রোগী দেখে পেটের ভাত জুটাতে হবে না।

কিন্তু আমাদের সময়ে তো এরকম ছিল না স্যার?

ছিল না, তখন দুদিনের জন্য একটা উদ্দীপ; এসেছিল মুসলমান সমাজে। নেতাই নেই তো সে উদ্দীপনা টিকিয়েই রাখবে কে আর তা কাজেই বা লাগাবে কে? মুসলমান লেখাপড়া করে, টাকা করে, ভেতরে কিছু পার্টস থাকলে সমাজের কাজে তা না লাগিয়ে

গভর্ণর ভাইসরয়ের নেকনজরে পড়বার জন্য ঝুলোঝুলি কামড়াকামড়ি লাগিয়ে দেয়। মেম্বার হয়, কাউন্সিলর হয়, করদ রাজ্যের দেওয়ান হয়। এই তো অবস্থা।

এত কথা ইদ্রিস আগে কখনো ভাবে নি, চোখেও পড়েনি তার। গুম হয়ে বসে থাকে সে। পায়ের নিচে যেন মাটি দেখতে পায় না। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলে চলেন, ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। দেখি কী হয়? এদিকে আমার বইগুলোরও সেই এক দশা। মুসলমানের বই পড়ে ডাক্তার হওয়া যায় কেউ যেন বিশ্বাসই করতে চায় না। কলকাতায় এতগুলো হোমিওপ্যাথির দোকান, কোন একটা দোকান আমার বই রাখতে রাজি হলো না। একবার ভেবেছিলাম সীজন টিকেট করে নিজেই সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়াবো, বই ক্যানভাস করব। তা শরীরে কুলোয় না। ইচ্ছে পর্যন্তই, কিছু করতে পারলাম না।

এ যেন এক অন্য মানুষ। এ মানুষকে ইদ্রিস আগে দেখেনি। ভালো করে তাকিয়ে দেখে, সত্যি বুড়ো হয়ে গেছেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব। মুখের চামড়া ঢিলে হয়ে এসেছে। দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে বলে চোখ কুঁচকে তাকান। হাত কাঁপে। গায়ের জামাটাও নুন ময়লা, এখানে ওখানে জ্যালজেলে হয়ে পড়েছে, একটু টান লাগলেই ছিঁড়ে যাবে। অথচ এই প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে সে দেখেছে ধবধবে ধোয়া দুধের মতো শাদা টুইলের শার্ট পরতে, তাতে রূপোর বোতাম লাগানো। তার অনুকরণে ইদ্রিসও টুইলের শাদা শার্ট পরতে শুরু করে দিয়েছিলো। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের চেহারা দিয়ে যেন আলো ঠিকরে বেরুতো। সে আলো আজ নেই। সারারাত জ্বলবার পর নিভে যাওয়া অপরিচ্ছন্ন সলতের মতো দেখাচ্ছে তাকে।

ইদ্রিস মাথা নিচু করে রইলো।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব শেষ অবধি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটিয়ে বললেন, থেকে যাও আমার এখানেই। আমি তো কিছু দিতে পারবো না। সে সামর্থ্য নেই। আগের মতো খাবে–পরবে, বাড়ির ছেলের মতো থাকবে।

সেই আমার যথেষ্ট স্যার।

তবু বলি, তোমার মতো গুণী ছেলেকে এভাবে নষ্ট হতে আমি দেখতে পারবো না। সুযোগ পেলে সুযোগ ছেড়ো না, এই একটা উপদেশ তোমাকে দিই।

যে আঘাত ইদ্রিস পেয়েছে তার ফলে মনটাই যেন অসাড় হয়ে গেছে তার। নিজেকে নষ্ট করেছে কী করছে না সে উপলব্ধিটুকু ধরে এমন মন তার আর নেই।

সে বলল, আপনি যদি কখনো কোথাও সুযোগ করে দিতে পারেন তো না হয় যাবো। আমার এমন পয়সা নেই যে নিজে প্র্যাকটিসে নামতে পারি আর আপনার কাছে যদি না থাকতে পারি তো কলকাতাতেই থাকবো না।

থাকো কিছুদিন। দেখি কী হয়।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ঐ রকম মানুষ। দেখি কী হয় বলা যেন তার মুদ্রাদোষ। ইদ্রিস জানে, তাকে পেয়ে তিনি খুশিই হয়েছেন। এই ভেঙ্গে পড়ার মুহূর্তে তার কাছে থাকতে পেরে

সে নিজেও কৃতার্থ বোধ করছে। তাকে সে শুধু শিক্ষক হিসেবেই দেখেনি, দেখেছে পিতা হিসেবে, প্রাণদাতা হিসেবে, তার স্বপ্ন সফলের পেছনে সবল বাহু হিসেবে।

রয়ে গেল ইদ্রিস। সকালে উঠে কলেজে যায়। নিচের ক্লাশে পড়ায়। ছাত্র সাকুল্যে আটজন। ইদ্রিস প্রায় শূন্য ক্লাসঘরে বক্তৃতা করে এমন উচ্চকণ্ঠে যেন পঞ্চাশ একশ ছাত্রে গমগম করছে কক্ষ। প্রাণ ঢেলে পড়ায়। রাত জেগে পড়াশোনা করে পড়াশোনার জন্যে। ডাঃ সেন আর। ডাঃ চক্রবর্তীর কলেজের ছাত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে এমন ছাত্র গড়ে তোলার কাজে যেন প্রাণপাত করবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে সে। বিকেলে রুগী দেখে ডিস্পেন্সারীতে বসে। ডাঃ খানের দস্তুর মতো সেও পয়সা নেয় না, শুধু ঔষধের দাম ছাড়া।

সে আসার পর থেকে অনেকটা ভারমুক্ত হয়েছেন ডাঃ খান। এখন বেশ অবসর পেয়েছেন। তিনি। ইদ্রিসের অনুরোধে বৃহৎ মেটেরিয়া মেডিকা লিখছেন বাড়িতে বসে।

কিন্তু বই লেখার মতো অবসর পেয়েও ডাঃ খান তেমন উৎসাহ পেতেন না বই লেখার। বিবেক তাকে দংশন করত। ইদ্রিস বিনি পয়সায় তার কলেজ চালাচ্ছে, ডিস্পোরী দেখছে। আর তিনি তার সুযোগ নেবেন এরকম ধাতের মানুষ তিনি নন। গোপনে গোপনে চেষ্টা করতেন কোথাও যদি একটা হিল্লে করে দেয়া যায় ইদ্রিসের। কিন্তু মুসলমান দরিদ্র একজন হোমিওপ্যাথ, হোক না সে যতই প্রতিভাবান, এই কলকাতায় তার প্রতিষ্ঠা খুব সহজে সম্ভব নয়। অথচ একটা ডিস্পেন্সরী করে দেবেন ইদ্রিসকে এমন পয়সাও ডাঃ খানের নেই। যদি তা পারতেন তাহলে কী আনন্দ হতো তার সেই কথাটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বারবার স্মরণ করেন তিনি আর বিষণ্ণ হন। এভাবেই চলছিল।

তারপর গেল কাল এলেন হাজি জয়েনউদ্দিন। পতিদহের বড় তরফ। ভাইসরয় কাউন্সিলের মেম্বার, উত্তর বাংলার প্রতাপশালী জমিদার প্রৌঢ় হাজি জয়েনউদ্দিন।

তখন ডিস্পেন্সারীতে ছিল ইদ্রিস। হাজি সাহেব এসে ডাঃ খানের খোঁজ করলেন। ডাঃ খান। তখন ছিলেন না। শুনে হাজি সাহেব বললেন, তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই আমি এ যাত্রা কলকাতা এসেছি। আজকেই দেখা হওয়া দরকার। সম্ভব হলে আজ রাতেই কিংবা কাল সকালে আমি পতিদহে ফিরে যাবো। তা আপনি কে?

ইদ্রিস জবাব দিয়েছিল, ওঁর ছাত্র ছিলাম। ওঁর সঙ্গেই আছি।

বেশ, বেশ। তা একটা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন? বলবেন পতিদহের হাজি সাহেব এসেছেন।

সেকেণ্ড ইয়ারের একটা ছেলে তখন বসেছিল। সে বলল, আমি স্যারের বাসায় যাচ্ছি খবর দিতে।

হাজি সাহেবের নাম শুনে তখুনি এলেন ডাঃ খান। হাজি সাহেব তাঁকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে দুজনে মোসাফা করলেন। কুশল বিনিময় হলো। সারাক্ষণ সসম্ভ্রমে পাশে দাঁড়িয়ে রইলো ইদ্রিস। সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে অতিথি সাধারণ কেউ নন এবং প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাঁকে অসীম শ্রদ্ধাভক্তি করেন।

হাজি সাহেব বললেন, সময় কম। কথাটা বলেই ফেলি। আমার একজন ডাক্তার দরকার।

ডাক্তার দিয়ে কী করবেন?

লোকে ডাক্তার দিয়ে কী করায় শুনি, আঁ?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব লজ্জিত হেসে বললেন, তাতো বটেই।

হ্যাঁ, একজন ডাক্তার আমাকে দিতে হবে। কাছারি বাড়িতে দাঁতব্য ডিস্পেন্সরী খুলেছি। জানেন তো, এলোপ্যাথি আমার দুচোখের বিষ। আর হোমিওপ্যাথির ভক্ত হলাম তো আপনার জন্যেই। আপনাকে পতিদহে নিয়ে যাই এতবড় সৌভাগ্য আমার হবে না। তাছাড়া কলকাতায় আপনার কলেজ আছে, ছাত্র তৈরি করছেন; পতিদহে চেরিটেবল ডিস্পেন্সরীর মেডিক্যাল অফিসারের চেয়ে এ অনেক বড় কাজ। আপনার কোনো পাশ করা ভালো। চরিত্রবান ছাত্র থাকলে তাকে সাথে করেই নিয়ে যেতাম।

একই সঙ্গে দুজনের চোখ পড়ল দুজনের দিকে। ইদ্রিস আর প্রিন্সিপ্যাল খান। ইদ্রিস চোখ নামিয়ে নিয়ে সরে গেল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব কুঞ্চিত করে ভাবতে লাগলেন।

কী, আছে তেমন কেউ?

প্রশ্ন করলেন হাজি সাহেব।

ভাবছি।

সাথে করেই নিয়ে যাবো। কাল থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট। থাকা–খাওয়া ফ্রি। মাইনে দেবো চল্লিশ টাকা।

হুঁ।

অবশ্য পতিদহ বড় ব্যাকওয়ার্ড জায়গা। সে কথাটাও পরিষ্কার বলা ভালো। সেই জন্যেই চল্লিশ টাকা দিচ্ছি। ডাক্তার হলেই শুধু চলবে না, দেশ গাঁয়ের মানুষকে ভালোবাসে, আল্লা রসুলের পাবন্দ এমন ছেলে চাই। আর জানেন তো, দিতে আমি কার্পণ্য করি না। নিজের ছেলেপুলে নেই। এই নিয়েই থাকি। পতিদহে গেলেই যে জীবন নষ্ট হয়ে যাবে এমন নয়। আমিও তার ভবিষ্যৎ দেখব।

সে আমি জানি। জানি বলেই ভাবছি, কাকে দেওয়া যায়।

হাজি সাহেব বসে বসে তার দাঁতব্য ডিস্পেন্সারীর বর্ণনা দিতে লাগলেন। বললেন, ওষুধপত্তর যা দরকার হবে তারও একটা লিস্ট চাই। সাজসরঞ্জামেরও।

ডাঃ খান ইদ্রিসকে ডাকলেন। বললেন, পতিদহে যাবে?

ইদ্রিস কোনো উত্তর দিল না। এ রকম আকস্মিক প্রশ্নের উত্তর চট করে তার মাথায় এলো না। যখন বুঝল হাজি সাহেবও তাকিয়ে আছেন তার দিকে, তখন উত্তর না দেয়াটা অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে বিবেচনায় সে বলল, আপনি বললে নিশ্চয়ই যাবো স্যার।

তখন ডাঃ খান হাজি সাহেবকে বললেন, ওর সামনে বলেই বলছি না। আমার কলেজ থেকে এরকম ছেলে বেরোয়নি। ওর চেয়ে যোগ্য আর কাউকে দেখি না। শুধু গরিব বলে এতদিন কিছু করতে পারে নি, আমার এখানেই পড়ে আছে। আপনি সুযোগ দিলে ওর একটা বড় উপকার হয়।

হাজি সাহেব তখন ইদ্রিসের নাম পরিচয় জিগ্যেস করলেন। তারপর হাজি সাহেব ডাঃ খানকে বললেন, ওষুধপত্র যা যা লাগে আর সাজ–সরঞ্জাম আপনিই দিয়ে দিন।

কিন্তু আজ রাতের ভেতরে তো সব তৈরি হয়ে উঠবে না। তাছাড়া কলকাতায় এসেছেন আমার গরিবখানায় দাওয়াত কবুল করবেন না, সে হতেই পারে না।

বেশ তো। কাল সকালের মেলে যাতে রওয়ানা হতে পারি সে রকম ব্যবস্থা করে নি। আমি এখন বেরুচ্ছি। ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।

সেখানে গেলে কি আর রাতে আমার গরিবখানায় আসতে পারবেন?

খুব পারবো। রাত দশটা হোক এগারোটা হোক আসবোই। আর ডাক্তার– ইদ্রিসকে লক্ষ্য করে হাজি সাহেব বললেন, আপনি তৈরি হয়ে নিন। যা যা লাগে সব দেখে শুনে নিন। এখন তো আপনি আমারই লোক। ভালো কথা, বিশটা টাকা রেখে যাচ্ছি। নিজের কিছু কেনাকাটা থাকলে এ থেকে করে নেবেন।

আপত্তি করাবার আগেই দশ টাকার নোট দুটো তিনি গুঁজে দিলেন ইদ্রিসের হাতে।

তিনি চলে গেলে ইদ্রিস ডাঃ খানকে বলল, স্যার!

কী?

কিছু বলতে পারল না ইদ্রিস। অনেকক্ষণ পরে শুধু উচ্চারণ করল, কিছু না স্যার।

হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফরমের শেষ মাথায় চলে গিয়েছিল ইদ্রিস। সেখানে কাঠের ফলকে বড় বড় করে নাগরী, বাংলা আর ইংরেজিতে লেখা তিস্তা। অনেকক্ষণ যেন বোধগম্য হলো না, এ কোথায় আছে সে? তিন ভাষাতেই লেখাটার আলাদা আলাদা অক্ষর পড়ল সে। তারপর সম্মুখে তাকিয়ে দেখল অন্ধকারে মাটির ওপরে লাল একটা বড় তারা যেন নেমে এসেছে। তিস্তা ব্রীজের ওপর জ্বলছে লাল বাতি।

হাওয়া বইছে সোঁ সোঁ করে। একটু ঠাণ্ডা করছে। মাথার চাঁদিতে হাত দিয়ে দেখল হিমে বরফ হয়ে আছে চুলগুলো। সে ফিরল।

প্ল্যাটফরমের এক কোণায় বেহারি কুলিরা বসে জটলা করছে। পিঠের সঙ্গে ভাঁজ করা হাঁটু গামছা দিয়ে বাঁধা। চমৎকার একটা ছবি বিশ্রামের। একজন হেড়ে গলায় চোখ বুজে গান করছে। বাকি সবাই শুনছে তন্ময় হয়ে। তার সে উচ্চ কণ্ঠ বহুদূর পর্যন্ত শোনা যেতে লাগল।

সব কিছু কেমন আপন মনে হতে লাগল ইদ্রিসের।

সে দূরে দাঁড়িয়ে গান শুনলো খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ দেখল হাজি সাহেবের হুকুমবরদার যেন অন্ধকার ফুড়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কী ব্যাপার?

রান্না হয়ে গেছে। হুজুর আপনার জন্যে বসে আছেন।

তাই তো বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

সেই সময়ে একটা কুকুর কেঁদে উঠল কোথাও। গা–টা শিরশির করে উঠল তার। অকারণে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বিয়ে করতে বেরুবার সময় চৌকাঠে হোঁচট খেয়েছিল সে। অর্থহীন এই মনে পড়া।

দূর, দূর।

কিছু বললেন?

হুকুমবড়দার প্রশ্ন করল।

না, কিছু না। চলো।

এসে দেখে, হাজি সাহেব জায়নামাজ পেতে নামাজ পড়ছেন। পাশে খাবার সাজানো। ধোঁয়া উঠছে গরম ভাত থেকে। সে বলল, এখানে পানি কোথায়? আমিও নামাজ পড়ে

নি। সালাম ফিরিয়ে হাজি সাহেব বললেন, কোথায় ছিলেন? আপনাকে না দেখে জামাতের জন্যে আর দেরি করলাম না।

ভারী লজ্জিত হলো ইদ্রিস। সে এককোণে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে শুরু করে দিল।

২. ভোরে উঠে দেখে প্ল্যাটফরমে

ভোরে উঠে দেখে প্ল্যাটফরমে আট বেহারার পালকি দাঁড়িয়ে আছে। জামাতে নামাজ আদায় করে নাশতা করে নিল ওরা। হাজি সাহেব বললেন, কুড়িগ্রাম পৌঁছে যাবো বিকেল চারটে নাগাদ। পতিদহে পৌঁছতে রাত দুপুর হয়ে যাবে।

ইদ্রিস শুনেছিল পতিদহ অনেক দূরে। ব্যাকওয়ার্ড প্রেস যাকে হাজি সাহেব বলেছিলেন। এখন তা হাড়ে হাড়ে টের পেল সে।

স্টেশনের ওপাশে এসে সে দেখল লাইট রেলওয়ের যাত্রীরা জটলা করছে। খেলনার মতো খোলা বগি আর এই এতটুকুন ইঞ্জিনটা দাঁড়িয়ে আছে।

এ গাড়ি কোথায় যায়?

কুড়িগ্রাম।

অবাক হলো ইদ্রিস। কুড়িগ্রাম যায়! তবে যে হাজি সাহেব পালকি আনিয়েছেন! ব্যাপারটাই কেমন গোলমেল মনে হলো তার। একজন যাত্রীকে আবার শুধালো, কুড়িগ্রাম যায় এ গাড়ি?

হা।

জিগ্যেস করে জানতে পারলো, যাত্রী আর কিছু হলেই গাড়ি ছাড়বে। কুড়িগ্রাম পৌঁছে যাবে দুপুর নাগাদ।

দ্রুত পায়ে হাজি সাহেবের কাছে এসে ইদ্রিস বলল, আমরা ট্রেনে যাচ্ছি না কেন?

কোন্ ট্রেন? ঐ যে খোলা বগি, ওতে?

অবজ্ঞা এবং অনুকম্পা মেশানো গলায় হাজি সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

জি। ওরা বলছে এ গাড়ি নাকি দুপুর নাগাদ কুড়িগ্রাম পৌঁছে যাবে।

তা যেতে পারে।

তাহলে পালকিতে খামোকা দেরি করে লাভ কী?

হেসে ফেললেন হাজি সাহেব। বললেন, ডাক্তার, সময়টাই শুধু দেখলেন, আর কিছু চোখে পড়ল না আপনার?

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ইদ্রিস।

হাজি সাহেব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হঠাৎ? বললেন, ঐ খোলা গাড়িতে যেতে বলেন আমাকে?

কেন, দোষ কী?

কী, বলছেন কী আপনি?

নিজেকে সংযত করে ফেললেন পতিদহের বড় তরফ হাজি জয়েনউদ্দীন, ভাইসরয় কাউন্সিলের মেয়র। আবার হাসলেন। পিঠে একটা মৃদু থাবড়া বসিয়ে দিলেন ইদ্রিসের। বললেন, সবার পক্ষে ও গাড়িতে সোয়ার হওয়া সাজে না। হলোই বা দু ঘণ্টায় পৌঁছে যাবো। তাতে কী? খোলা বগিতে কাঠের বেঞ্চে বসে সাধারণ মানুষের সাথে গা ডলতে ডলতে তাড়াতাড়ি পৌঁছুনোর বদলে পালকিতে তিনদিন লাগলেও তা ভালো। বুঝেছেন ডাক্তার?

যুক্তিটা কিছুতেই বুঝতে পারল না ইদ্রিস। কোথায় যেন খটকা লাগছে তার। কলকাতায় মানুষটাকে যেমন মনে হয়েছিল ঠিক তেমনটি মনে হলো না এখন। কৃষক নেতা ফজলুল হকের সঙ্গে ওঠবোস করেন, গায়ের লোকের সুবিধের জন্যে দাঁতব্য ডিস্পেন্সারি খুলেছেন, তার মুখে এ কথা শুনতে হবে এ আশা করেনি ইদ্রিস।

ইদ্রিসের একরোখা স্বভাবটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে বলল, তাই বলে সুবিধের কথা ভাববেন না?

কিসের সুবিধে?

তাড়াতাড়ি পৌঁছুচ্ছেন। তাছাড়া মিটার গেজ ব্রড গেজের গাড়িতে তো চড়েন না এমন নয়। লাইট রেলওয়েতে আপার ক্লাশ নেই দেখছেন না।

ঘাড় বাঁকা করে দাঁড়িয়ে রইল ইদ্রিস

হাজি সাহেব বললেন, কী তর্কই করবেন, না পালকিতে উঠবেন? অনেকটা পথ যেতে হবে। ইদ্রিস ভাবলো, কাজটা বোধ হয় সে ভালো করছে না। যার চাকরি করতে যাচ্ছে তার সঙ্গে তর্ক করাটা অন্যায় হচ্ছে। কী দরকার তার এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে। সে যখন পতিদহে যাবে বলেই কলকাতা থেকে পা বাড়িয়েছে, তখন আর পালকি বা লাইট রেলওয়ের প্রশ্ন তোলা কেন? তার পৌঁছুনো দিয়ে কথা।

তবু মনের মধ্যে কেমন খচখচ করতে লাগল। হাজি সাহেবও গম্ভীর হয়ে গেছেন। তার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল মুখটা থমথম করছে বোশেখ মাসের হঠাৎ মেঘের মতো। হাজি সাহেবের পেছন পেছন সেও পালকিতে গিয়ে উঠল। পালকিতে চড়ার অভ্যেস নেই। উঠতে গিয়েই মাথায় একটা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল দরোজার সঙ্গে। কপালে হাত বুলোতে বুলোতে ইদ্রিস এক পাশে পা ভাঁজ করে বসলো।

দুলে উঠল পালকিটা। তারপর আট বেহারার হুমহাম কোরাসের তালে তালে চলতে লাগল কুড়িগ্রামের দিকে।

এই ইঞ্জিনের পানি খাবার কল পেরুলো . সিগন্যাল পেরুলো। চৌবাচ্চার পাশ দিয়ে প্রাইমারি স্কুলের সমুখ দিয়ে, গায়ের ভেতর দিয়ে পাকি গিয়ে মাঠে পড়ল।

ভোরের রাঙা আলো আস্তে আস্তে সোনার মতো হয়ে গেল। উজ্জ্বল সূর্যালোকে খেতখামার যেন হাসতে লেগেছে। ঘাসের ওপর, ফসলের ডগায়, পথের পাশে বুনো ফুল আর কন্টিকারির ঝোঁপের মাথায় শিশির দেখা যাচ্ছে এখনো। একটু পরে আর থাকবে

না। রোদ টেনে নেবে সব সিক্ততা। ইদ্রিসের মনে পল এই তো সেদিনও গাঁয়ের বাড়িতে শিশির ভেজা মাঠে খালি পায়ে হেঁটেছে সে। খালি পায়ে ভোরের শিশির লাগলে স্বাস্থ্য ভালো হয়। মনটা প্রসন্ন হয়ে এলো ইদ্রিসের। একটু আগে হাজি সাহেবের সঙ্গে তর্ক করে মনটা অস্বস্তিতে ভরে ছিল। শিশিরের মতোই সে অস্বস্তিটুকু একেবারে উবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

ইদ্রিস বলল, চমৎকার দেশ।

হাজি সাহেব গলা সাফ করে বললেন, পছন্দ হয়েছে?

জি, হ্যাঁ।

জীবনে কত দেশ ঘুরলাম ডাক্তার, রংপুরের কাছে কোনটাই লাগে না। বিশেষ করে তিস্তা থেকে এই রাস্তাটা। পতিদহে গেলে আর ফিরে আসতে চাইবেন না আপনি।

পরিবেশ-শোভন হাসি ফুটে উঠল ইদ্রিসের ঠোঁটে।

হ্যাঁ, দেখে নেবেন। আমার জন্মভূমি বলে বলছি না, দেশ বিদেশ থেকে কতজন পতিদহে আমার গরিবখানায় এসেছেন। যাবার সময় সবাই বলে গেছেন, পতিদহের তুলনা হয় না।

সেই হাসিটা বিলম্বিত হলো ইদ্রিসের ঠোঁটে। সে ভাবলো তার নিজের গায়ের কথা। মাঠের কথা। বিরাট বিলের কথা। কালো অতল পানি তার। আড়াআড়ি পাড়ি দিতে

সাহস হয়নি কোনো দিন কারো। একবার সে কয়েক বন্ধুর সঙ্গে কী করে যেন গিয়ে পড়েছিল মাঝ বিলে। লোকে বলেছিল, জ্বীনে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। মা কত দোয়া পড়ে ঝাড়ফুঁক করে দিয়েছিলেন।

ঝমঝম একটা শব্দে চমক ভাঙ্গলো ইদ্রিসের। বাইরে তাকিয়ে দেখে ধোঁয়া উড়িয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে মার্টিন কোম্পানির গাড়ি চলেছে কুড়িগ্রামের দিকে। খোলা বগিতে সার সার কালো মাথা দেখা যাচ্ছে। ছবির মতো মনে হচ্ছে। পৃথিবীতে কত সুন্দর দৃশ্য আছে দেখার, তার কিছুই সে দেখেনি।

পর মুহূর্তেই সচকিত হয়ে উঠল ইদ্রিস। এই ভোলা গাড়ি আবার সেই তর্কের তিক্ত স্মৃতিটা ফিরিয়ে এনেছে। আড়চোখে সে তাকাল হাজি সাহেবের দিকে।

হাজি সাহেব বললেন, ডাক্তার, এবার দিল্লিতে গিয়ে কথা প্রায় পাকা করে এসেছি।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ইদ্রিস।

হাসলেন হাজি সাহেব। বললেন, এ লাইট রেলওয়ে আর বেশি দিন নেই। মিটার গেজ বসলো বলে। তখন তিস্তা কুড়িগ্রাম করবেন ট্রেনে দুবেলা। খোদ ভাইসরয়ের কানে তুলে। দিয়েছি। জানেন তো ইংরেজের জাত সে এক আজব চীজ। কথা মনে ধরল তো কাজের হুকুম সঙ্গে সঙ্গে। হুকুম হলো তো কাজ হয়ে গেল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে। এই জন্যেই সান নেভার সেটস ইন ব্রিটিশ এম্পায়ার। আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে ইংরেজের কাছ থেকে।

আপন মনে কথা বলে চলেছেন হাজি জয়েনউদ্দিন। তার কিছু কানে যাচ্ছে ইদ্রিসের, কিছু যাচ্ছে না। সে ভাবছে তার ভবিষ্যতের কথা। কোথায় চলেছে, কী হবে, এই সব সাত সতেরো। ছেলেবেলা থেকেই মনের মধ্যে বড় হওয়ার সাধ, কিন্তু কী করলে বড় হওয়া যায় শুধু সেইটাই জানা নেই।

পাশ করবার পর গ্রামে ফিরে যাবার সময় প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেছিলেন, কলকাতায় থাকলেই বড় হওয়া যায় না। যে বড় হবার গায়ে থেকেও হতে পারে।

কথাটা নতুন করে মনে পড়ল ইদ্রিসের। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব নিজে যখন তাকে পতিদহে পাঠাচ্ছেন তখন তার আর দ্বিধা করবার কী আছে? দেখাই যাক না, ভাগ্য তাকে আর কতদূরে নিয়ে যায়, আর কত ভেলকি দেখাতে পারে ভাগ্য সেইটে এবার পরখ করবে ইদ্রিস।

ঢুলুনিতে সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছিল। এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল ইদ্রিস। হাজি সাহেব তার অনেক আগেই কান্ হয়ে পড়েছেন। মিহি সুরে নাক ডাকছে তার এক পয়সার বাঁশির মতো। ইদ্রিসের আর এখন রাগ হয় না, হাসি পায়। ট্রেন ফেলে পালকি চড়াটা পরম একটা পরিহাসের বিষয় মনে হয় তার। একটু যেন করুণাও হয় তার। সেই করুণা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

ঘুম ভাংগে রাজার হাটের কাছে এসে। ঈদগাঁর পাশে বড় বড় কটা কদম গাছ। তারই ছায়ায় পালকি নামানো হয়েছে। বিশ্রাম নিচ্ছে বেহায়ারা। রান্না চড়েছে।

অনেকক্ষণ পালকিতে বসে থেকে পা ধরে গিয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর পর্যন্ত বেড়িয়ে এলো সে। ঈদগা পেরিয়ে টিনের চালায় মাদ্রাসা। মাদ্রাসার পেছনে আম বন। আম বনের তলা দিয়ে ছায়াঢাকা পথ গাঁয়ের দিকে চলে গেছে। পথের পাশে মুদি দোকান। বাতাসা কিনছে পেট বড় ন্যাংটো কয়েকটা ছেলে। একজনের হাতে একটা শালুক ধরা। শালুকটা নেতিয়ে পড়েছে।

এই ছেলে তোর নাম কী?

ছেলেটা চমকে ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে তার দিকে তাকায়। তারপর ঝেড়ে দৌড় দেয় গায়ের দিকে। চিৎকার করে ডাকে—- চাচা গো। হা হা করে হাসে ইদ্রিস।

ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে ছেলেটার হয়েছে কী?

আরো খানিকটা এগোয়। দেখে জলার ওপরে মেলা শালুক ফুটে রয়েছে। ছেলেরা মাছ ধরছে গামছা পেতে। খিলখিল করে হাসছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় কালো কালো মোটা কতগুলো শোল হুটোপাটি করছে জলায়।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের মাছধরা দেখল ইদ্রিস। মাছধরা তো নয় এ যেন পানি ছোঁড়াছুঁড়ির মহোৎসব। আহা, ভারী ঠাণ্ডা নিশ্চয়ই জলার পানি। সবুজ লালা ঘাসে হেলে দুলে নাচছে গলা পর্যন্ত সে পানিতে ডুবে। ইদ্রিস যদি গোসল করতে পারত, ভারী ভালো লাগত। হুস হুস হুস হুস শব্দ ওঠে। ছেলেরা কান খাড়া করে দাঁড়ায়। হাতের গামছা হাতে থেকে যায় তাদের। তারপর একসঙ্গে ছুটতে থাকে সবাই একদিকে।

ঐ তো মার্টিন কোম্পানির ট্রেন দেখা যাচ্ছে। কুড়িগ্রাম থেকে ফিরে এলো যাত্রী নিয়ে। হাসি পায় ইদ্রিসের। দ্যাখো কাণ্ড, তারা এখনো রাজার হাটই ছাড়াতে পারল না, আর ওরা কুড়িগ্রাম ছুঁয়ে ফের তিস্তায় চলেছে। হাজি জয়েনউদ্দিনের মাথায় বোধ করি ছিট আছে।

কতদিন এ রকম প্রশান্ত স্বচ্ছন্দ মন নিয়ে ইদ্রিস মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াতে পারে নি। আজ এত ভালো লাগছে যে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে এইখানে জলার ধারে হেলে পড়া বাবলার ছায়ায় সারাজীবন বসে থাকে সে।

কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যাবে। তাকে আবাখোঁজাখুঁজি করতে লোক বেরুবে। পা চালিয়ে ফিরতি পথ ধরে ইদ্রিস।

মাঠের পারে গাঁয়ের পথ যেখানে আরেক গাঁয়ের দিকে এঁকেবেঁকে চলে গেছে সেখানে একটা জটলা চোখে পড়ে ইদ্রিসের। কান্নার শব্দও যেন শোনা যায়। ব্যাপার কি?

কাছে এসে দেখে কচি বৌ নিয়ে ঝাঁকড়া চুল বর দাঁড়িয়ে আছে মাথা হেঁট করে। তাদের ঘিরে বুড়োবুড়ি আত্মীয়স্বজন মরা কান্না করছে। বড় দূরে বিয়ে দিলে বুঝি?

না গো না। ঐ যে দুটো অশ্বত্থ গাছ ঐ হোথায় দেখা যায়। তারপরে পাথার। পাথারের পরে শিমূলকলি গ্রাম। সেই গ্রামে মেয়ে বিক্রি করে কপাল চাপড়াচ্ছি।

মেয়ে বিক্রি কী রকম? চোখ কপালে তোলে ইদ্রিস। তাও জানো না। এ দেশে মেয়ের বিয়েকে মেয়ে বিক্রি করা বলে। মাইয়া বেচেয়া খাইছং। অদ্ভুত তো। গাঁয়ের পিঠে গায়ে

বিয়ে দিয়েছ, এত কাঁদতে আছে? বলেন কী। গাঁয়ের পিঠে গাঁ বই কী! ভিন্ গাঁ মানেই বিদেশ। বৈদ্যাশে মাইয়া চলি যায়, বুক ফেটে কান্না আসে না?

অবাক হয়ে যায় ইদ্রিস। দুক্রোশ দূরও হবে না, একে বলে দূর বিদেশ। আসলে বোধ হয় বাপ মার এক মেয়ে গোয় না তাও না। আর পাঁচ মাইয়া আছে ঘরৎ।

হাজি সাহেব তাকে দেখেই বললেন, খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে! কেমন ঠিক বলি নি, রংপুরের মতো দেশ হয় না।

জি, তাই দেখছি। খুব ভালো লাগছে।

এই যে এলেন এদেশে, আর যেতে মন চাইবে না।

দেখি!

আমি বলি, দুদিন পরে পরিবার নিয়ে আসুন, মাকে নিয়ে আসুন। আমি জমি করে দেব, ঘর তুলে দেব, রংপুরের লোক আপনাকে মাথায় করে রাখবে।

ইদ্রিসের মন রঙিন হয়ে উঠে মুহূর্তে। তার নিজের বাড়ি হবে, সংসার হবে। এই রকম জলার পারে শালুক ফুটে থাকবে। কদমের মিষ্টি ঘ্রাণে বাতাস মম করবে। খুব ভালো হয়। একটা বাইসাইকেল কিনবে ইদ্রিস। দূর দূরান্তে রোগী দেখতে যাবে। কলকাতায় বাইসাইকেল দেখত আর তৃষিতের মতো চেয়ে থাকত ইদ্রিস। আহা, অমন যদি তার একখানা থাকত! ছেলেবেলায় চৌবাড়িতে কে একজন বাইসাইকেল চড়ে এসেছিল। সে

কী কাণ্ড! দল বেঁধে ক্লাশ ভেঙে ছেলের দল গিয়েছিল অদ্ভুত সেই দুই চাকার যন্ত্র দেখতে। মানুষটা কী যাদু জানে? এমনি দাঁড় করিয়ে রাখো, কাৎ হয়ে ধপাস করে পড়ে যাবে। মানুষটা উঠলো কী তেজি একটা খরগোশের মতে বাই বাই করে ছুটতে লাগল। তাজ্জবই বটে। ছেলেরা গবেষণা করে, বাই বাই করে ছোটে বলেই বাইসাইকেল নাম। কে একজন বলে, ধ্যাৎ, সাইকেলে আবার শব্দ হয় নাকি। আসলে এটা বাইছাগল। দেখছিস না ছাগলের মতো দুটো শিং। ইদ্রিসের মনে পড়ে হ্যাঁণ্ডেলের কালো দুটো গ্রীপ দেখে সেদিন তারও বিশ্বাস হয়েছিল এ নিশ্চয়ই কলের ছাগল।

খেয়ে দেয়ে জোহরের নামাজ পড়ে আবার পালকিতে উঠল ওরা। হুমহাম কোরাসের তালে তালে পালকি চলল রাজার হাট ছাড়িয়ে। এই যায় পলাশবারী, এই গেল শিমুলকলি, এই এলাম কালীরবাজার। হুমহাম হুমহাম। জোরে চলো ভাই জোরে চলো। পা চালিয়ে চলা। বেলাবেলি কুড়িগ্রামে পৌঁছুতে হবে। নইলে খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

ইদ্রিস বলল, আজ এক ঘটনা দেখলাম হাজি সাহেব।

কী ডাক্তার?

রাজারহাটে মেয়ে বিদায় দিতে এসে বাপ মা আর আত্মীয়স্বজনের মরা কান্নার কথা বলল ইদ্রিস।

এই ব্যাপার?

পিঠেপিঠি গাঁ। এত কান্নার কী আছে?

হাজি সাহেবের গলাটা হঠাৎ ভারী নরোম শোনাল। তিনি বললেন, আমার এখানকার মানুষগুলো ভারী সরল ডাক্তার। নিজের গাঁ ছাড়া কিছু বোঝে না। গাঁয়ের বাইরে এক পা ফেলে না। গাঁয়ের বাইরে জীবনে দুচার বারের বেশি এরা যায় না। বুঝলেন?

ইদ্রিসের বিস্ময় তবু যায় না। এ যুগে এরকম মানুষও হয় নাকি। হাজি সাহেব বলে চললেন, সারা বাংলায় এমন সরল এমন ঘরকুনো মানুষ আপনি পাবেন না ডাক্তার। বিদেশীকেও ভারী ভয় করে ওরা। এই যে দক্ষিণ থেকে এলেন আপনি, আপনাকে ওরা বলবে ভাটির মানুষ———ভাটিয়া। ভাটিয়াকে বড় ভয় করে রংপুরের লোক। ভাবে, তাদের ঠকিয়ে-লুটপাট করতে এসেছি ভাটি থেকে। আমার মনে হয় কী জানেন, এককালে দক্ষিণ থেকে ডাকাতের দল আসতো এ দেশে। এখানকার ফসল ভালো। বীজ বুনলেই সোনা ফলে। দক্ষিণের মতো কষ্ট করে ফসল ফলাতে হয় না। তাই দক্ষিণের মানুষ যে লোভ করবে এতে আর আশ্চর্য কী?

হুঁ তাতো বটেই।

ভালো কথা মনে পড়ল। হাজি সাহেব একটু ঘন হয়ে বসলেন। গলা নামিয়ে বললেন, আপনাকে একটু সাবধানে চলতে হবে।

মানে?

না, না, সাবধান মানে প্রাণের ভয়ে সাবধান হতে বলছি না। ঐ যে বললাম ভাটির মানুষকে এরা ভয় করে, অবিশ্বাস করে। আপনাকে একটু বুঝে সমঝে চলতে হবে।

ভয়টা ভাঙ্গাতে হবে। অবিশ্বাস দূর করতে হবে। ওদের মন জয় করতে হবে। একবার যদি ওদের মনের নাগাল পেয়ে যান, একবার যদি আপনাকে ওরা নিজদের বলে ভাবতে পারে, তাহলে দেখবেন আপনার জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে ওরা গররাজি হবে না।

ইদ্রিস চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। এতক্ষণ মন বড় চঞ্চল হয়েছিল পতিদহে পৌঁছুনোর জন্যে। মনে মনে সে ছবি দেখছিল কেমন হবে তার ডিস্পেন্সারী, কী ভাবে সাজাবে। সে দেখছিল, ঐতো রোগীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, সে ওষুধ দিচ্ছে, ঐতো সে ব্যাগ ঝুলিয়ে দূরে যাচ্ছে রোগী দেখতে। এখন, হাজি সাহেবের এই কথার পর, ছবিটা যেন মুছে গেল। একটা উদ্বেগ এসে সব ঢেকে দিয়ে গেল। মনের মধ্যে কেমন শিরশির করতে লাগল তার। মনে হলো, হঠাৎ তার কাঁধে এক গুরুভার চেপে বসেছে। সে বাইরের চলমান দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে বসে রইল।

তার সে ভাব গোপন রইলো না হাজি সাহেবের কাছে। তিনি হেসে বললেন, আরে ডাক্তার যে একেবারে ভয় পেয়ে গেলেন।

ম্লান হাসলে ইদ্রিস। বলল, কই না।

ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি রয়েছি কী করতে! ভাটির লোক হলেই যে বাঘ ভালুক হবে তা নয়। ওরা হচ্ছে শিশুর মতো। একটু আদর চায়, আন্তরিকতা চায়। ব্যাস, দেখবেন আপনার পায়ে পায়ে ঘুরছে পতিদহের মানুষ।

হাজি সাহেব যথাসম্ভব চেষ্টা করেন ইদ্রিসের মনের মেঘ দূর করতে। বলেন, দোষ এদেশের লোকেরই বা কী দেব। তাহলে এক গল্প বলি শুনুন।

ইদ্রিস বাইরের দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে আনে।

হাজি সাহেব বলতে থাকেন, শুনুন তাহলে। নাম ধাম বলব না। দুদিন বাদে নিজেই বুঝতে পারবেন কার কথা বলছি। যার কথা হচ্ছে সে এদেশেই আছে। বিরাট জমিজমা সহায়। সম্পত্তি, টাউনে চার পাঁচখানা পাকা বাড়ির মালিক। বাড়ি ঢাকায়। আজ থেকে বছর তিরিশেক আগে এসে পড়ে কুড়িগ্রামে। লোকটা ম্যাজিক জানতো কিছু কিছু। দলবল কিছুই নেই। একাই খেলা দেখায়। খেলা দেখাতে এলো এ অঞ্চলে। হাটে হাটে যায়, ম্যাজিক দেখায়। লোকে হাঁ করে দেখে আর ভাবে না জানি কত বড় দৈবশক্তি আছে তার। বলছিলাম না, আমার দেশের মানুষের মতো সরল মানুষ আর হয় না। সেই ভদ্রলোক ম্যাজিক দেখিয়ে নিরীহ লোকজনের ওপর এমন প্রভাব করে ফেলল যে, দুদিন বাদে তারা সব তার কথায় ওঠবোস করতে লাগল। এই করে, বলব কী ডাক্তার, পাঁচ টাকা বিঘে দরেও জমি হাতাতে লাগল সে। অপুত্রক যারা তারা জমি লিখে দিয়ে যেতে লাগল সেই ম্যাজিশিয়ানের নামে। ম্যাজিশিয়ানই বটে! ইদ্রিস বলল। নইলে লোকজন এত বোকাও হয়! কিছু বুঝতে পারে না?

এই হচ্ছে আমার দেশের মানুষ। হাজি সাহেব খেদের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন। তারপর শুনুন। বছর পাঁচেকের মধ্যে এ অঞ্চলের মধ্যে কেউকেটা হয়ে পড়ল লোকটা। এখন পাটের কারবার করে। গঙ্গার পাড়ে নিজের গুদাম করেছে কয়েকটা। লাখপতি। আর যাদের জমি যাদের টাকা ঠকিয়ে নিয়েছিল তারা না খেয়ে মরছে। বলুন, এরপরও ভাটির মানুষকে বিশ্বাস। করবে এরা? এতো একটা শুনলেন। এ রকম কত ঘটনা হয়েছে খাস রংপুরে, গাইবান্ধায়, নীলফামারীতে।

হঠাৎ ইদ্রিস প্রশ্ন করে বসল, আমিও তো ভাটির লোক। আমাকে বিশ্বাস করলেন কী করে? হাতের পাঁচ আঙুল কি আর সমান হয় ডাক্তার?

সমান না হলেও পাঁচটাই আঙুল তো বটে। আমিও যে ওরকম হবে না তার গ্যারান্টি কী? হাজি সাহেব ঐ কুঞ্চিত করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, না, মানুষের গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। এ কী আর ওয়েস্ট এণ্ড কোম্পানির ঘড়ি?

বলেই হা হা করে হেসে উঠলেন হাজি জয়েনউদ্দিন। সে হাসির সঙ্গে অস্বস্তি বোধ করল ইদ্রিস। হাজি সাহেব বললেন, প্রিন্সিপ্যাল খান তোক চিনতে ভুল করেন না। তিনি যখন আপনার নাম করেছেন, তখনি জানি মনের মত লোক পেয়েছি আমি। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বাংলার গৌরব, মুসলমান সমাজের জন্যে তার যে দান তা আজ কারো চোখে না পড়ুক কাল পড়বে।

বেলা পড়ে আসছে। আরো জোরে পা চালাও ভাই। টোগরাইহাটের শ্মশান দেখা যায়। শ্মশান বাঁয়ে রেখে আবার বড় সড়কে উঠল পালকি।

ইদ্রিস লক্ষ্য করছিল লাইট রেলওয়ে আর ডিস্ট্রিকট বোর্ডের এই রাস্তা যেন জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। এই একটা আরেকটাকে কেটে সরে যাচ্ছে, আবার কাছে আসছে, বেশ খানিকটা সমান্তরালে গেছে, এক সময়ে আর দেখা গেল না, আবার দেখা গেল। কত রং বেরংয়ের পাখি, গাছ-গাছালি। বড় বড় আমের ছায়ায় ঢাকা ডিস্ট্রিকট বোর্ডের পথ। কোথাও বুঝি হাটবার আজ। দলে দলে হাটুরেরা ঘাড়ে পিঠে বাকে করে শাক-

সবজি চাল–ডাল তেলের কলসি দুধের ভাড় নিয়ে চলেছে। তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, রাস্তা ছাড়া রাস্তা দাও।

বেহারারা সুর করে বলে আর তালে তালে পা ফেলে এগোয়।

ঐ যে দূরে কুড়িগ্রামের ডাক–বাংলো দেখা যায়। লাল টিনের ছাদে অপরাজিতা লতিয়ে উঠেছে।

বেলাবেলিই পৌঁছুনো গেছে। ধরলার পাড়ে মসজিদ। সেখানে মাগরেবের নামাজ পড়ল ওরা। নামাজিরা অনেকেই হাজি জয়েনউদ্দীনকে সালাম দিল, কুশল জিজ্ঞেস করল।

কোত্থেকে আসছেন?

কলকাতা থেকে। ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি আমার ডিস্পেন্সারীর জন্যে। এই যে ডাক্তার। ইদ্রিসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন তিনি। ইদ্রিসকে তারা গভীর চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

বাড়ি কোথায় আপনার?

সিরাজগঞ্জ।

ইদ্রিস যেন দেখতে পায় সন্দেহের কালো ছায়ায় আঁধার হয়ে আসে প্রশ্নকর্তার চোখ। হাজি সাহেব বলছিলেন ভাটির মানুষকে এরা ভয় করে। কথাটা বোধ হয় মিথ্যে নয়।

একজন হাজি সাহেবকে জিজ্ঞেস করে, রেললাইন কদ্দুর? নতুন ইটিশন কবে হবে?

এই হলো বলে। সামনের মাসে দিল্লি যাচ্ছি আবার।

হবে তো?

হবে না মানে? যে বুদ্ধি দিয়েছি! বলেছি নতুন করে সড়ক বাঁধতে হবে না লাইনের জন্য। এখন যে ডিস্ট্রিকটু বোর্ডের রাস্তা আছে তার ওপরই লাইন বসানোর পরামর্শ দিয়ে এসেছি।

লাইনটা দিতে পারলে হাজি সাহেব আপনার একটা নাম থেকে যাবে।

হাজি জয়েনউদ্দীন হাসেন ছোট্ট করে। নিজের প্রশংসা শোনতে অভ্যস্ত তিনি। ইদ্রিস লক্ষ্য করে, প্রশংসা গ্রহণ করেন এমন সুন্দরভাবে যে নিলজ্জিত মনে হয় না তাকে। প্রসঙ্গ বদলানোর জন্যে হাজি সাহেব বলেন, ডাক্তার পছন্দ হয়েছে?

ভালোই তো। দশ বিশ ক্রোসের ভেতরে ডাক্তার নাই। গরিব আমরা দোয়া করি আপনাকে।

ধরলা পার হতে বেশিক্ষণ লাগল না! অদ্ভুত এই নদী। এখন পড়ে আছে সুতোর মতো চিকন চাকন। বর্ষায় ফুলে ওঠে, বাদামি রংয়ের পানি টগবগ টগবগ করতে থাকে, একেকদিনে বিশ তিরিশ হাত পাড় ধ্বসিয়ে খলখল করে হাসতে হাসতে ছোটে।

ওপারে ঘোড়া এসেছে হাজি সাহেবের। মনিবকে দেখে ঘোড়া মাটিতে পা ঠুকতে থাকে। হাজি সাহেব ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন। বললেন, ডাক্তার আমি যাচ্ছি। ওরে তোরা দেরি করিসনে বাবা। জোর পায়ে পালকি দিয়ে আসবি।

অন্ধকারের ভেতরে এক নিমিষে হারিয়ে গেলেন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে পতিদহের বড় তরফ। ইদ্রিস দাঁড়িয়ে রইল পালকির সামনে। কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে নদী। দূরে বিন্দুর মতো চলমান এক ফোঁটা আলো দেখা যাচ্ছে। এক গা থেকে আরেক গায়ে যাচ্ছে কেউ। কয়েকজন লোক খেয়ার আশায় বসে ছিল, তারা উঠে গেল নৌকোয়। চারদিকে নিস্তব্ধ, শান্ত, স্থির। আকাশে ঝকঝক করছে তারা, যেন কেউ একটা বিরাট সুজনী পেতে রেখেছে।

এতক্ষণ হাজি সাহেব সঙ্গে ছিলেন, সে ছিল একরকম। এখন একা, সে আরেক রকম। দুর দুর করতে লাগল বুকের ভেতরটা। আল্লাহ যা করেন তা মানুষের মঙ্গলের জন্যই। ইদ্রিসের মনে পড়ল কোরানের সেই আয়াতটা ওঠ হে বাচ্ছাদিত মানব, তোমার প্রভু তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি কি তোমাকে এতিম হিসেবে পান নাই? এবং সেখান থেকে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করেন নাই?

মনটা দৃঢ় সংযত হয়ে এলো তার। আপনা থেকেই নুয়ে পড়া মাথা খাড়া হয়ে উঠলো। এই বরং ভালো হয়েছে। নতুন করে সে শুরু করবে জীবন, স্কুলে যাবে অতীত। এ মাটিকে সে আপন করে নেবে। এখানে সে তার স্বপ্ন রচনা করবে। এই যে মানুষগুলো তার চারদিকে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে, এদের মুখ সারাজীবন ধরে পরিচিত হয়ে

থাকবে তার। তাই নতুন করে আবার সে সবার দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর পালকিতে বসে বলল, বেরিয়ে পড় ভাই।

পালকি চলল অন্ধকার মাঠঘাট পেরিয়ে। টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল ইদ্রিস। মায়ের কথা মনে হলো। মা তার নাম ধরে ডাকছেন। কতদূর থেকে মিহি হয়ে ভেসে আসছে তার গলার আওয়াজ। ই–দ্র–ই–স।

মা এখন কী করছেন? হয়ত হাঁস–মুরগির খোপ বন্ধ করে ডিবে হাতে এ দুয়োর সে দুয়োর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হাতে হাতে তুলছেন উঠোনে কী পড়ে আছে না আছে। একটু পরে নামাজ পড়তে বসবেন মা। নামাজ শেষে বার বাড়িতে বাবার কবর জিয়ারত করতে আসবেন। পায়ের কাছে ভাঙা ইটের উপর ডিবেটা জ্বলতে থাকবে, কাঁপতে থাকবে বাতাসের দাপটে। ইদ্রিসের একেক সময় মনে হয় মা বোধ হয় সারাদিন পরে এই সময়টাতে বাবার কবরের কাছে আসেন কথা বলতে। ঠিক যেমন বাবা বেঁচে থাকতে মা রাতে পানের বাটা নিয়ে বসতেন বাবার পায়ের কাছে। রাত হবে আরো। রমজান চৌকিদার জাগো হো হাঁক দিয়ে দাওয়ায় চেপে বসে এক টুকরো আগুনের আবদার করবে। আগুন আছে তো তামাকও দাও। তামাক টানবে আর বলবে, আপনার কোনো ভয় নাই মা জননী। দুয়োরে ঝাঁপ দিয়া শুইয়া থাকেন গা।

মার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে কে জানে? কাল একটা চিঠি লিখবে ইদ্রিস।

৩. ডিস্পোরীটা পছন্দ হয়েছে ইদ্রিসের

ডিস্পোরীটা পছন্দ হয়েছে ইদ্রিসের। কাছারির পাশে জামরুল গাছের নিচে ছোট্ট একটা ঘর ভোলা হয়েছে উঁচু ভিটের পরে। এই ডিস্পেন্সরী। নতুন আলমারি, চেয়ার, টেবিল এসেছে। কাঁঠাল কাঠের গন্ধটা ভারী মিষ্টি। তার ওপরে রং করা হয়েছে কাঁচা সোনার।

ঘরের মাঝখানে রোগী দেখবার টেবিল। এক পাশে ডিসপেনসিং টেবিল। পরিষ্কার শাদা কাপড় বিছানো। মাঝখানে নিকেলেছ নিক্তি রাখা ওষুধ মাপবার জন্যে। পাশে এক কৌটো চুন। চুন আবার কেন? শিশিতে ওষুধ ঢেলে গায়ে চুনের দাগ দিয়ে কাঠি টেনে মাত্রাভাগ দেখানো হয়।

থরে থরে ওষুধ সাজানো আলমারিতে। আছে ডাক্তারী বইপত্র, স্টেথসকোপ, সুগার অব মিলক। আর ডিস্পেন্সরীর রেজিস্টার, রিপোর্ট বুক। ইদ্রিসের তোরঙ্গে কবে থেকে মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু আর কায়কোবাদের অমিয় ধারা ছিল। সে বই দুটোর গায়ে নতুন মলাট চড়েছে। ঠাই পেয়েছে আলমারিতে।

প্রথম দিন পাত্রমিত্র নিয়ে হাজি সাহেব এসেছিলেন ডিস্পেন্সারীতে। বসতে দেয় কোথায়? তবে ভাবনা কী? হুকুম বরদার পেছনে পেছনে চেয়ার আনছে। হেলনা বেঞ্চ আসছে আর দুজনের মাথায়।

হাজি সাহেবকে দেখেই ইদ্রিস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আপনি বসুন এখানে।

আরে না, ও হলো ডাক্তারের চেয়ার। এ ধরগে তোমার কাছারি। তোমার গদিতে আমি বসতে পারি। তা আজ রোগী আমিই! নাড়িটা দেখোত ডাক্তার।

হাজি জয়েনউদ্দিন তুমি বলতে শুরু করে দিয়েছেন ইদ্রিসকে। সেটা লক্ষ্য করে খুব খুশি হতে পারল না ইদ্রিস। চেষ্টা করল মুখভাব স্বাভাবিক রাখতে। চাকরি করি বলেই একেবারে কেনা হয়ে গেছি নাকি?

ইদ্রিস বলে, নাড়ি দেখব, বুক দেখতে হলে বুক।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন হাজি জয়েনউদ্দিন। আচমকা আবছা হেসে বললেন, ঠিক ঠিক। পার্শ্ববর্তীকে শুনিয়ে বললেন, এই না হলে ডাক্তার? তারপর ইদ্রিসকে আবার বললেন, তুমিও তো তেমনি। ঠাট্টা করছিলাম। তাও বোঝে না। এরা ধরেছে আমাকে দিয়েই নাকি ডিস্পেন্সারীর কাজ শুরু করতে হবে। তা দ্যাখোই না নাড়িটা।

ও এই কথা। আমি ভাবলাম সত্যি কিছু হয়েছে বুঝি।

যদি চেপে ধরো, তাহলে অসুখ যে একেবারে নেই তা বলব না।

কী রকম?

পারবে তার ওষুধ দিতে?

বিবরণ বললে সাধ্যমতো চেষ্টা করব। বাকি আল্লাহর হাতে।

ঠিক বলেছ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন হাজি জয়েনউদ্দিন। বলেন, ঠিকই বলেছ। বাকি আল্লাহর হাতে। বাকিই বা বলছ কেন, সবটাই তাঁর। সেই গল্প শোনোনি? তোমরাও শোনো হে।

পাত্রমিত্র ঘন হয়ে বসে।

হাজি সাহেব বলেন, একবার এক লোক এসেছে বড়পীর সাহেবের কাছে। সে বললে বাকিটুকু আল্লাহর হাতে তা আমাকে বুঝিয়ে দিন। বড়পীর সাহেব তখন বললেন, তোমার ডান পাটা ওঠাও তো বাপু। ওঠালো লোকটা। বড়পীর সাহেব বললেন, এবার বা পা ওঠাও। তাও হলো। লোকটা বলল, এবার? বড়পীর সাহেব তখন হেসে বললেন, এবার দুটো পাই একসঙ্গে ওঠাও দেখি। লোকটা বলল, বাহ্ তা কী করে হয়? দুপা এক সঙ্গে কেউ ওঠাতে পারে নাকি? লোকটা শুনে বেকুব। মাথা নিচু করল। হুজুর বললেন, ঐটুকু আল্লাহর হাতে।

মারহাবা, মারহাবা।

পাত্রমিত্রেরা সমস্বরে বলে উঠল। ইদ্রিস তাদের সঙ্গে ঠিক যোগ দিতে পারল না। সে নিজে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। কোরান রসুল মানে। নামাজ পড়ে। কিন্তু তাই বলে আল্লাহর। অস্তিত্বের প্রমাণ এভাবে গ্রহণ করতে সে রাজি নয়। চমকা গল্প দিয়ে কি আল্লাহকে ব্যাখ্যা করা যায়! কিন্তু গল্পটার সঙ্গে বড়পীর সাহেবের নাম জড়িত রয়েছে বলে সে কিছু বলল না। হাজি জয়েনউদ্দিন রহস্যময়ভাবে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

ইদ্রিস জিজ্ঞেস করল, কই রোগের কথা বললেন না?

বলব, আরেকদিন বলব। আজ নয়। বলতেও হবে না। তুমি নিজেই বুঝে নিতে পারবে। দাওয়াইপত্র অনেক করেছি। তুমি যদি একবার চেষ্টা করতে চাও, দেখতে পারো। ফল হবে আশা নেই।

হঠাৎ গা মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

যাক চলি। বাইরে কজন রোগী এসেছে দেখছি। কাল বিকেলে হাটে ঢোল সহরৎ করে দেয়া হয়েছিল?

পার্শ্ববর্তী একজন বলল, হ্যাঁ হুজুর হয়েছিল।

তা লোক এত কম দেখছি যে!

ইদ্রিস হেসে বলল, সে কী কথা! দেশে রোগ না থাকা তো খুশির কথা।

হে না, তুমি জানে না। এখানে ঘরে ঘরে রোগী। ডাক্তার কোন দিন ছিল না বলে চাড় বোঝে না। এছাড়া বিলেতি ওষুধ, কলকাতার ডাক্তার, ভাটির মানুষ—-ম্যালা গেরো আছে। এদের মনে একটু বিশ্বাস এনে দাও, ওষুধে একটু ফল হোক, দেখবে তোমার বারান্দা থইথই করবে রোগীতে।

হাজি সাহেব চলে গেলেন। পাত্রমিত্রের দল পেছনে গেল। রোগী দেখতে বসল ইদ্রিস। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের কথা একবার মনে করল। মনে মনে বলল, নাম যেন থাকে।

আল্লাহু শাফি, আল্লাহু কাফি। রোগী হয়েছিল কুল্যে পাঁচজন। সবারই এক ব্যামো। ম্যালেরিয়া। ভারী মুশকিলে পড়ল ইদ্রিস। হোমিওপ্যাথিতে ম্যালেরিয়া চট করে সারে না। সময় লাগে। কিন্তু সময় নিলে তার বদনাম হবে। বলবে, এ কেমন ডাক্তার? ওষধ দিল, জ্বর গেল না। সে রকম জ্বর ধামাচাপা দিতে পারে কাঁচা সিঙ্কোনা, কুইনিন। মরে গেলেও সে নীতিভ্রষ্ট হতে। পারবে না; কুইনিন দিতে পারবে না।

পানিতে গুলে ওষুধ দিল সবাইকে সে। বলল, কাল আবার আসবে। আর এর পর যারাই। আসবে বলে দিও খালি শিশি ভালো করে গরম পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করে যেন আনে। শিশি তো আর জমিদার সাহেব মাগনা দিবেন না।

দুপুর পর্যন্ত রোগী দেখার সময়। বিকেলে ডাক্তারকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারো। চার আনা ভিজিট। আর যাতায়াতের ব্যবস্থা তোমাদের। হাটবারে বিকেল বেলাতেও ডিস্পোরী থাকবে বিনি পয়সায় ওষুধ দেয়া হবে।

এসব নিয়মকানুন হাজি সাহেবই বেঁধে দিয়েছিলেন।

সেদিন দুপুরে ডিস্পেন্সারী বন্ধ করে কাছারিতে গেল ইদ্রিস। হাজি সাহেব দরবার নিয়ে ছিলেন তখনো। এক পাশে চুপ করে বসল ইদ্রিস। বসে বসে বিচার-আচার দেখতে লাগল। মহাল থেকে পাইক প্রজা দর্শনপ্রার্থীরা এসেছে। তাদের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। সে আলাপের কিছুই সে মাথামুণ্ডু বুঝতে পারল না। সব আবেদন নিবেদনের পেছনে পূর্ব ইতিহাস রয়েছে, সেটা জানা না থাকলে উটকো শুনে কিছু ঠাহর করা মুশকিল।

একে একে বিদায় নিল সবাই। বেলা তখন মাথার পর থেকে চলতে শুরু করেছে। একটু পরেই জোহরের আজান পড়বে।

কী ডাক্তার, কথা ছিল কিছু?

জি।

আজ যা দেখলাম সবই ম্যালেরিয়ার রোগী।

হুঁ।

হোমিওপ্যাথি তো সঙ্গে সঙ্গে জ্বর কমায় না। সময় লাগে। রোগীরা যদি তা না বুঝতে চায়? একদিনে ফল না পেয়ে আর ওষুধ নিতে না আসে?

কোনো উপায় নেই?

আছে। কুইনিন দিতে হয়।

দাও কুইনিন। মানা করছে কে? না থাকলে আনিয়ে নাও!

জি, কুইনিন তো দেয়া যায় না।

কেন?

হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা সেটা।

চুপ করে গেলেন হাজি সাহেব। ভ্রু গভীরভাবে কুঞ্চিত হলো তাঁর।

চোখ তীক্ষ্ণ করে শুধালেন, কী রকম?

সে এক কথায় বলা যাবে না। পুরো অর্গানস পড়তে হবে।

অর্গানস আবার কী?

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সংজ্ঞা পদ্ধতি তাতে লেখা আছে।

একটু রুক্ষ মেজাজেই হাজি সাহেব বললে, সে বই পড়ে আমি কী করব? আর তুমিও বেশ কথা বলছ দেখি। রোগী মারা যাচ্ছে, তবু যে ওষুধে কাজ হয় সে ওষুধ দেবে না। থাকবে তোমার অর্গানস নিয়ে?

জি, কুইনিনে কাজ হয় ওপরে ওপরে। ভেতরে রোগ যেমনকার তেমনি থাকে। হোমিওপ্যাথিতে সময় লাগলেও সমূলে রোগ দূর হয়।

তা হোক। এরা বহুদিন ভুগছে। তুমি কুইনিন দাও।

বললাম তো, সেটা আমি পারি না।

তাহলে এসেছ কেন?

যদি আপনি নিজে একটু বলে কয়ে দিতেন! এ চিকিৎসায় ধৈর্য ধরতে হয়।

তুমি বলতে পারো না?

আমি বলেছি, কিন্তু ওরা শুনবে বলে মনে হলো না। কাল একজনও ফেরৎ আসবে বলে ভরসা পাচ্ছি না।

বেশ তো। কুইনিনই দাও না। ডিস্পেশারী খুলে যদি কারো উপকারই না হলো, তাহলে আর খোলা কেন? যাও, যা ভালো বোঝো করো গে। মনে রেখো, মরহুম আব্বাজানের নামে এ ডিস্পেন্সরী দিয়েছি। একেকটা রোগী ভালো হলে দোয়া পৌঁছুবে তার রুহে। বেলা অনেক হয়েছে, গোসল খাওয়ায় অনিয়ম করে কাজ করবে সেটা আমার পছন্দ নয়।

ভীষণ ক্ষুব্ধ মন নিয়ে ইদ্রিস তার ঘরে ফিরে এলো।

ঘর বলতে, কাছারির লাগোয়া মসজিদের পেছনে মাঠ, সেই মাঠ পারে অতিথ-পথিকের জন্যে চারচালা টিনের ঘর। মাঝখানে বেড়ার পার্টিশন করা। একটা কামরা ইদ্রিস ব্যবহার করছে।

বিছানায় এসে চিৎ হয়ে শুয়ে রইলো সে। কিছুতেই সে বুঝতে পারছে না, হাজি সাহেবের সঙ্গে সেই তিস্তা থেকে কথায় কথায় তার বিরোধ হচ্ছে কেন? তার নিজের দোষ? সে কি একগুয়ে? তাও তো নয়। সে যা ভালো মনে করেছে, যুক্তি দিয়ে যা সঙ্গত

মনে করেছে, তাই বলেছে সব সময়। তাতে যদি কেউ ক্ষুণ্ণ হন, রুষ্ট হন, তাহলে কী করতে পারে?

অনেকক্ষণ কড়িকাঠের দিকে গুম হয়ে তাকিয়ে রইল ইদ্রিস ডাক্তার। অন্দরমহল থেকে চাকর এসে তাড়া দিল গোসলের জন্যে। ইদ্রিস তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিল। বলল, শরীর ভালো নেই। খাবো না এবেলা।

না, কাজটা বোধহয় ভালো হচ্ছে না। নতুন জায়গায় নতুন কাজে এসেই মনিবের সঙ্গে বিরোধ হলে লোকে তারই নিন্দে করবে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব শুনলেই বা কী মনে করবেন? বড় মুখ করে তাকে পাঠিয়েছেন তিনি। আজ রাতেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে একটা চিঠি দেবে সে। হ্যাঁ তাই ভালো। তার কাছে পরামর্শ চাইবে ইদ্রিস। তিনি যদি কুইনিন ব্যবস্থা করতে বলেন তো হোক শাস্ত্র বিরুদ্ধ ওস্তাদের কথা শিরোধার্য করে সেকুইনিনই দেবে।

আর মাকেও চিঠি দেয়া হয় নি। তাকেও আজ লিখবে ইদ্রিস। বরং এখনই বসা যাক। সকালের রিপোর্ট লেখাও পড়ে আছে। ও বেলা যদি কেউ কল দিয়ে বসে তো আর সময়ই পাওয়া যাবে না।

এমন সময় জোহরের আজান পড়ল। দুপুরের তপ্ত মাঠ পেরিয়ে ভেসে আসা সেই আজানের ধ্বনিটাকে মনে হলো মড়ক লাগা গ্রামে কেউ আল্লাহর করুণা ভিক্ষা করে বুকফাটা আর্তনাদ করছে। ধড়াস্ করে উঠলো ইদ্রিসের বুকের ভেতরটা। তওবা, তওবা। এ সব কী ভাবছে সে? অমঙ্গল ভাবতে নেই। অমঙ্গল ভাবলে নিজের অমঙ্গল হয়।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে পুকুরে নাইতে গেল ইদ্রিস। ফিরতি পথে নামাজটাও সেরে নিল সে। জামাত তখন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কাছারির কর্মচারীরাই জামাতের সামিল। নোয়াখালীর এক গাঢ় সুরমা পড়া মৌলবি ইমামতি করেন মসজিদে। তিনি ততক্ষণে হাত বেধে ফেলেছেন। ইদ্রিস প্রায় দৌড়ে এসে জামাতে সামিল হয়েছিল।

নামাজ শেষে মৌলবি সাহেব বললেন, আঁরে দয়াই দিবেন আপনে।

কাল আসবেন ডিস্পেন্সারীতে। সকালে।

আঁর লাইন। আঁর বিবি সাব হায়েজ লই বহুৎ তকলিফ পায় তারি।

খ্যা খ্যা করে মৌলবি সাহেব হাসলেন খানিক। আরো কী বলবার জন্যে ঘনিষ্ঠ হতেই ইদ্রিস বলল, আচ্ছা কাল শুনব।

নাহ, আজ সত্যি সত্যি মেজাজটা তার ভালো নেই। নইলে যে যা বলছে তা–ই অসহ্য লাগছে। কেন? হতেও তো পারে, মৌলবি সাহেব তার স্ত্রীর অসুখের জন্যে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ইদ্রিসের যেন মনে হলো, অসুখের কথাটা গৌণ, আসলে লোকটা রোগ বর্ণনার ছলে নিজের ক্ষুধার্ত কামচেতনায় সুড়সুড়ি দিতে চাইছে।

ফিরে এসে দেখে, অন্দর মহলের চাকরটা কাসার ঢাকা জামবাটি নিয়ে তার অপেক্ষা করছে। এ আবার কী?

তোমরা খাবার নন শুনি বুবুজান মোর হাতোৎ দুধ পাঠেয়া দিল। জামবাটিটা মেলে ধরল বছির।

ন্যান, টপাটপ পান করি ন্যান।

ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল ইদ্রিসের। যেন এক ঝলক আনন্দ বহুদূর থেকে এসেই ঝাপটা দিয়ে চলে গেল।

বাটিটা হাতে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, বুবজান কেরে বছির?

তাও জানেন না?

বল্ না শুনি?

হুজুরের বড় বইনের মাইয়া। তাই মরি যাবার পর একে যে মাইয়া তা আনি আইখছেন হুজুর।

ও।

দুষ্কের কথা কী কমো তোমরার আগেৎ। হুজুরের ছাওয়া-পোয়া নাই। ইয়া আপন হতে আপন মাইয়া বুলি পালেন ওমরায়।

দুদিনেই এদেশের কথা বেশ শিখে ফেলেছে ইদ্রিস। সে যে আজ দুপুরে খাবে না, এই কথাটা নিশ্চয়ই হাজি সাহেবের ভাগনির কানে গেছে। বড়লোকের হঠাৎ এই প্রীতিটা তাকে কৌতূহলি করে তুলল। এদের ভাষাতেই সে কথা বলতে চেষ্টা করল।

ডাঙর হইছে তোর বুবু?

হয় নাই বলে? কন্ কী তোমরা? ছাওয়া–পোয়ার জননী হয়্যা যাইত এতখনে।

কেনে, বিয়াও হয় নাই কেনে?

না কন সে কথা। বেচেয়া খাইছলো তা তার বাপোমায়। সে ঘর ভাঙ্গি গেইছে। বজ্জাতের ঝাড় আছিল সে মানুষকোনা।

তাই নাকি?

মুই অ্যালায় যাও।

বছির যাবার জন্যে পা বাড়ায়। ইদ্রিস পিছু ডাকে, শোন শোন। তুই আবার তাকে বলেছিস কেন, কিছু খাবো না।

পুছ কইরেলে যে।

কাঁই?

এদের ভাষা অজান্তেই বেরিয়ে পড়ে ইদ্রিসের আবার।

কাঁই পুছ কইরলে রে!

কাঁই আবার? কাঁই দুধ পাঠাইলে। নিদ্রা যান তোমরা। মোর মেলা কাম পড়ি আছে। বছির চলে গেল।

চৌকির ওপর চুপ করে বসে রইলো সে। অবাক হয়ে দেখল কুইনিন নিয়ে মনের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল তার লেশমাত্র আর নেই। এ রকম কেন হলো, বুঝতে পারল না সে। দুপুরে খাবে না বলেছিল তখন সে রাগ করে। এখন এক বাটি দুধ খেয়ে খিদেটা যেন আরো চাগিয়ে উঠল।

হাসল ইদ্রিস। রাগ করে ভারী লাভ হলো তো?

আরে, রাগ সে করেছিলই বা কার ওপর?

এখানে সে চাকরি করতে এসেছে। কাজ নিয়ে কি রাগ করতে আছে? না সে রাগ চাকরি যে করে তার পোষায়?

হঠাৎ মনে পড়ল হাজি সাহেব তার কী এক অসুখের কথা একসময়ে বলবেন বলেছিলেন। বছিরের কথায় চোখ খুলে দিয়ে গেল তার। ছেলেপুলে হয় না—- এই অসুখ। সেই কথাটাই বলতে চেয়েছিলো হয়ত হাজি সাহেব।

কিন্তু সে তো এরকম কেস এর আগে কখনো হাতে পায় নি। তার বইতেও কিছু লেখা নেই। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে লিখলে হয়। হাজি সাহেবের জন্যে মনটা তার সহানুভূতিতে ভরে। উঠল। ইদ্রিস যখন বিয়ে করবে না বলে গো ধরেছিল তখন মা প্রায়ই বোঝাতেন, দ্যাখরে, ছাওয়াল না থাইকলে ঘরের আন্ধার যায় না।

ইদ্রিস তখনি কাগজ টেনে চার ভাঁজ করে ছিঁড়ে নিল। তারপর আসবার সময় শখ করে কেনা রাজা কলমটা বের করে চিঠি লিখতে বসল প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে।

কুইনিন নিয়ে যে বিরোধটা হয়েছিল তার আভাস দেবার ইচ্ছে ছিল চিঠিতে। এখন ভাবল, সে কথা থাক। শুধু জিগ্যেস করলেই হবে, কুইনিন তিনি অনুমোদন করেন কিনা। আর জিগ্যেস করবে—-নিঃসন্তান হাজি সাহেবের রৌদ্রতপ্ত চেহারাটা তার সামনে ভেসে উঠল।

৪. শীত পড়তে শুরু করেছে

শীত পড়তে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে চার পাঁচটা মাস কেটে গেল। এর ভেতরে অনেক কিছু হয়ে গেছে। ইদ্রিস এখন এদের ভাষায় চমৎকার কথা বলতে পারে। তার কথা শুনে বুঝবার উপায় নেই সে ভাটির দেশের মানুষ। গোড়াতেই সে বুঝেছিল এদের মন জয় যদি করতে হয়, বিশ্বাস জন্মাতে হয় তাহলে এদের ভাষা শিখতে হবে। ভাটি থেকে আগে যারা এসেছিল, তাদের উদ্দেশ্যও খুব ভালো ছিল না, এদের ভাষা শেখার দরকারটাও তারা টের পেত না। বরং হাসাহাসি করত ভাষা শুনে।

ইদ্রিসের এখানে এক নাম চালু হয়ে গেছে। কলা খাওয়া ডাক্তার। একদিন হাটে গিয়ে দেখে সোনার টুকরোর মতো কড়ে আঙ্গুল সাইজের কলা বিক্রি হচ্ছে। নাম কী বাহে এই কলার?

চিনিচাম্পা।

বাহ, ভারী সুন্দর নাম তো।

কী দর দিছেন তোমরা?

সুকি সুকি পণ।

অর্থাৎ এক পণ এক সিকি। আশিটা চার আনায়।

আধ পণ ধরি দে মোক।

চল্লিশটা কলা নিয়ে সেখানেই একটা ছাড়িয়ে মুখে দিল ইদ্রিস। ভারী মিষ্টি আর তেমনি সুঘ্রাণ। কর্পূরের মতো মাতাল করা। খেতে খেতে কলার খোসার স্তূপ জমে গেল পায়ের কাছে।

তাকিয়ে দেখে ছোট খাটো একটা ভিড়ও জমে তার চারদিকে। গায়ের লোকেরা সওদা করতে এসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে এই কাণ্ড দেখে! মুখ টিপে হাসছে। ফিসফিস করছে এ ওর কানে। ভারী মজা লেগেছে তাদের।

কী হে?

চল্লিশটার শেষ কলাটা মুখে পুরতে পুরতে ইদ্রিস বলে।

না, কিছু নোয়ায়।

দে, মোক আরো আধ পণ দে।

আরো চল্লিশটা কিনল ইদ্রিস।

চোখ কপালে উঠল জনতার। ইদ্রিস আরো গোটা দশেক খেল। মাথা দুলিয়ে বলল, অমৃত বুঝিস?

তাক আবার কী?

বুঝিস না। কী বুঝিস তাহলে? তোমরার চিনিচাম্পা অমৃত লাগিল আমার।

কী বুঝল, খুব হাসল সবাই।

সেই থেকে ইদ্রিসের নাম ছড়িয়ে পড়ল কলা খাওয়া ডাক্তার।

দূর দূরান্তে রোগী দেখতে গেলে, গাঁয়ের লোক তাকে এখন কলার ছড়া দেয়। বলে, খান তোমরা।

ইদ্রিস টের পায় ভেতর বাড়ির বৌ–ঝিয়েরাও উঁকি দিয়ে দেখছে তার কলা খাওয়া। খুব আমোদ লাগে তার।

আগে রোগী বাড়ি গেলে কিছু খেত না। চিড়ে মুড়ি মুড়কি দৈ ধরে দিত। ফিরিয়ে দিত। তাতে মনে কষ্ট পেত কেউ কেউ। কলার কথাটা চাউর হয়ে যাওয়ার পর সুবিধে হয়েছে। বাড়িওলাও ক্ষুণ্ণ হয় না, খিদেটাও যায়।

এদিকে তিস্তা থেকে কুড়িগ্রাম মিটার গেজ লাইন বসছে। কাজ শুরু হয়ে গেছে। হাজি সাহেব মাঝে মাঝেই যান দেখতে। বলতে গেলে তাঁর একার চেষ্টায় এত বড় একটা কাজ হচ্ছে এ অঞ্চলে। তার রাত দিনের ভাবনা এখন—- রেললাইন। রেললাইন ছাড়া মুখে কোনো কথা নেই। ভাইসরয় কী বললেন, রেল কোম্পানির লাল মুখো আইরিশ এঞ্জিনিয়ার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাকে রেলপথ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে শুনে কী রায়

দিয়েছিলেন, তার আপত্তি কোন কোন যুক্তিতে খণ্ডালেন হাজি সাহেব—- এইসব কথা এখন পতিদহের কাঁচারি বাড়ি গরম করে রাখে।

এঞ্জিনিয়ার বলেছিল, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা বড় এঁকেবেঁকে গেছে। তার ওপরে রেললাইন পাতা মানেই রেলও যাবে এঁকেবেঁকে। এতে গাড়ি খুব স্পীডে যেতে পারবে না। বড় জোড় ঘন্টায় পনেরো কুড়ি মাইল।

তা হোক।

হাজি সাহেব বলেছিলেন, নতুন পথ কাটতে সময়ও লাগবে, টাকাও লাগবে। এ অঞ্চলে মিটার গেজ লাইন আশু হওয়া দরকার। হাজার হাজার মণ উদ্বৃত্ত ধান চাল পাট শুপারি মহকুমার বাইরে যেতে পারছে না শুধু এই লাইনটার জন্যে। সরকারের কত বড় ক্ষতি। দেশের কতখানি অপচয়।

শেষ অবধি সেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার ওপরেই রেললাইন বসছে। ইদ্রিসের বড় ইচ্ছে ছিল একবার দেখে আসবে কী করে রেল বসায়। কিন্তু সময় পায় না। আজকাল রোগী এত হচ্ছে যে একদণ্ড বিশ্রাম নেবার ফুরসৎ হয় না তার।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ডিস্পেন্সরীতে রোগী দেখে। দুপুরে গোসল করে চারটি খেয়ে নিয়ে নামাজ পড়ে। তারপর লিখতে বসে রিপোর্ট। রিপোর্ট শেষ হতে না হতেই কল আসে। বেরুতে হয় এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে রোগী দেখতে।

গাঁয়ের লোক ডাকতে আসতো ঘোড়া নিয়ে। ঘোড়ার পিঠে যাবেন ডাক্তার। কিন্তু ইদ্রিসের ভারী অস্বস্তি হয় ঘোড়ার পিঠে চড়ে। কথাটা হাজি সাহেব জানতে পেরে সাইকেল কিনে দিয়েছেন তাকে। ঝকঝকে নতুন, তিন বন্দুক মার্কা বি–এস–এ সাইকেল। রডের সঙ্গে পাম্প মেশিন আঁটা। সাইকেলের ত্রিভুজাকৃতি পেটে কাপড়ের থলে লাগিয়ে নিয়েছে সে। তাতে থাকে স্টেথসকোপ, ওষুধের বাক্স, নামাজ পড়বার জন্যে টুপি গামছা। সিটের পেছনে চামড়ার খাপে লিক মেরামতের সাজসরঞ্জাম। বিকেল হতে না হতেই এখন কুয়াশা নেবে আসে। থোকা থোকা কাশফুলের মতো ভেসে বেড়ায় মাঠের ওপর, ঝুলে থাকে গাছের নিচু ডালে, খড়ের চালায়। কেমন শান্ত স্তব্ধ মনে হয় চারদিক। মনে হয়, খুব ভালো, খুব মিষ্টি কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে আর কিছুক্ষণ পরে। গলা পর্যন্ত বোম লাগিয়ে হাঁটতে বেরোয় ইদ্রিস। একা লাগে আরো বেশি করে পথের ওপরে উদ্দেশ্যহীন চলতে গিয়ে। একাকীত্বটুকু নেশার মতো জড়িয়ে ধরে ইদ্রিসকে। মনটা ক্ষমাশীল হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে যত দুঃখ আছে সব মিথ্যে মনে হয়। যত বিরোধ, যত দ্বন্দ্ব সব তুচ্ছ হয়ে যায় তার কাছে। ক্ষমাই এই মুহূর্তের মূল সুর হয়ে ওঠে তার মনে। কোথায় কোন্ ছেলেবেলায় শীত রাতে এক যাত্রা শুনতে গিয়ে গানটা ভারী ভালো লেগেছিল। অতল অতীত তোলপাড় করে কথাগুলো মনে পড়ে তার। একটু একটু। আবার মনে পড়ে না। খানিকটা স্মৃতি থেকে, খানিকটা নিজে বানিয়ে ইদ্রিস গুণগুণ করে, নিশি না পোহালে মন অভাগিনীর ভরসা কী? তারপর সন্ধ্যে হয়। আকাশটা নীলাক্ত লাল দেখায়। ডানা ঝটপট করে পাখিরা বাসায় ফেরে। এক দুই তিন চার। কালো কালো পাখিরা কোন্ মাঠঘাট পেরিয়ে তাল সুপারির বনের পাশ দিয়ে চলেছে। কোথা থেকে আজানের সুর ভেসে আসে। মনে হয় কোনো মানুষ নয়, প্রকৃতিই যেন ডাক দিচ্ছে যোজন দূর থেকে। পথের

পাশে কারো বাড়িতে হাঁক দেয় ইদ্রিস। নামাজটা। সেখানেই সেরে নেয় সে। তারপর ঘরমুখো হয়।

ঘরে এসে বারান্দায় কড়ি কাঠ থেকে ঝোলানো লণ্ঠন নাবিয়ে চিমনি সাফ করে। সলতে টেনে তোলে। আলো জ্বালে। দূরে শেয়ালের আনাগোনা শুরু হয়। দুদ্দাড় করে এক আধটা দৌড়ে মাঠ পেরোয়। কোনদিন ইদ্রিস চিঠি লেখে বসে বসে, ডাক্তারি বই পড়ে কোনদিন, আবার এক একদিন অমিয় ধারা খুলে মনে মনে আবৃত্তি করে।

এশার নামাজের আগেই বছির এসে হাঁক দেয়, ভাত দেইম গো ডাক্তারের ব্যাটা?

হাঁকটা অভ্যাসবশত দেয় সে। হাতে গামলা ধরাই থাকে। যতক্ষণ সে খায় বছির পাশে। দাঁড়িয়ে গল্প করে। তার গল্পের প্রধান বক্তব্য : বিশ্বসংসারের সবাই পাগল, এত পাগল নিয়ে সে আর পারে না।

আবার কোনো কোনো দিন রোগী দেখে ফিরতে রাত হয়ে যায় ইদ্রিসের। এক প্রহর, দুই প্রহর। ফিরে এসে দেখে লণ্ঠনটা কে জ্বালিয়ে সলতে ছোট করে রেখেছে। টেবিলের ওপর ঢাকা দেয়া আছে ভাত তরকারি। সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধোয় ইদ্রিস। বারান্দায় রাখা বালতির পানিতে মুখ গলা পা ধুয়ে খেতে বসে সে। পাশের ঘর থেকে মসজিদের মৌলবি সাহেব সাড়া দেন, ডাক্তার সাব নি?

জি হ্যাঁ।

একটু পরে মৌলবি সাহেব এসে জাঁকিয়ে বসেন। কী করে যে আলাপটা রোজ জ্বীন পরীর দিকে চলে যায় তা ভেবে পায় না ইদ্রিস। রোজই সে অন্যমনস্কতা থেকে জেগে উঠে দেখে কোথায় কার বৌকে কবে জ্বীন ধরেছিল সেই গল্প শুরু হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে মৌলবি সাহেবের উৎসাহ অসীম। মাথাটাও খুব খোলে। বর্ণনা দেন জীবন্ত ভাষায়। রূপ বর্ণনায় রীতিমত প্রতিভাবান মনে হয় তাকে। সব গল্পের শেষেই মৌলবি সাহেব দেখা দেন উদ্ধার কর্তা রূপে।

অসহ্য, অশ্লীল মনে হয় লোকটাকে। ইদ্রিস হুঁ হাঁ ছাড়া বিশেষ প্রায় কিছুই বলে না। কিন্তু পার পাওয়া যায় না তাতে। লেবি সাহেব প্রতিদিনই হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে প্রশ্ন করেন, জ্বীন পরীতে ইদ্রিসের বিশ্বাস আছে কিনা!

প্রতিদিনই ইদ্রিস বলে, আমার ঘুম পাচ্ছে মৌলবি সাহেব। কাল আলাপ হবে আবার। মৌলবি সাহেব বিরস মুখে ঘোঁৎ ঘোৎ করতে করতে খড়মের আওয়াজ তুলে পাশের ঘরে চলে যান।

সেদিন এমনি রোগী দেখে ফিরতে রাত দশটা হয়ে গেল। রোগীটাকে বাঁচাতে পারে নি ইদ্রিস। সান্নিপাতিক জ্বর। কিছুদিন থেকে চিকিৎসা চলছিল তার হাতেই। আজ বিকেলে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ায় কল দিয়েছিল তাকে।

বেরিয়ে পড়েছিল আছরের নামাজ পড়েই। রোগী বাড়িতে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। গিয়ে দেখে কান্নার রোল পড়ে গেছে বাড়িতে। খড়ের ঘ্রাণ আর মায়ের কান্না মিলে মিশে ভারী করুণ হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। হাত ধরে বুঝল, নাড়ি পাওয়া যাচ্ছে

না রোগীর। একটা ওষুধ দিল সে। মালিশের ব্যবস্থা করল। ঘর থেকে ভিড় সরিয়ে দিল। কিন্তু শেষ অবধি কিছুতেই কিছু হলো না। আটটার দিকে নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

হায়াত না থাকলে সে করবে কী? তবু যেন মনে হলো এ তারই পরাজয়। সে দুর্বল বলেই আজরাইল জয়ী হয়ে গেল আজ। মাথা নিচু করে সাইকেল ঠেলে বেরিয়ে এলো সে পথের ওপর। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল তারা ঝকঝক করছে দিগন্তের ওপরে। মা বলতেন, মানুষ মরে আকাশের তারা হয়ে যায়। একটা করে তোক মরলে আকাশে একটা তারা বাড়ে। সদ্য একজনকে মরতে দেখে এসে একাকী অন্ধকারে পথের ওপর দাঁড়িয়ে কথাটা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

দূর, দূর! এ সব কী ভাবছে! কদিন হলো দেখছে ইদ্রিস, তার ভেতরটা যেন তার কাছেই অচেনা হয়ে উঠেছে। সে তো অনেক দিন থেকেই একা; কিন্তু আগে সেটা চোখে পড়ত না, এখন পড়ে। কদিন থেকে বাড়ির কথা মনে পড়ে কারণে অকারণে। পৃথিবীতে অসম্ভব অবাস্তব যা কিছু হতে পারে সব যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। কিংবা হতে চায়। নিজেকে মনে হয় দুর্বল, অসহায়।

মনে হয়, খুব প্রবল একটা স্রোতে ভেসে চলেছে সে। তার নিজের যেন করণীয় কিছু নেই। যেদিকে নিয়ে যাবে সেদিকেই যাবে সে।

কৃষ্ণপক্ষ চলছে। পথ–ঘাট ভালো করে কিছু দেখা যায় না। প্রায় সবটাই আন্দাজের ওপর সাইকেল চালাতে হচ্ছে। তার দরুণ এক ঘণ্টার পথ পেরুতে লাগছে দুঘণ্টা। এই হরিরামপুরের শ্মশান পেরুলো। চিতা জ্বলছে একটা। অন্ধকারের একটা পাড়ে যেন

আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কেউ। সেদিকে তাকাতে যাচ্ছিল ইদ্রিস। হঠাৎ দেখে, দুটো লোকের ঘাড়ে সাইকেল তুলে দিচ্ছিল সে। এ অঞ্চলে সাইকেল আছে, একমাত্র তার। কাজেই অন্ধকারেও তারা চিনতে পারল তাকে। হেঁকে বলল, কাই বাহে, কলাখাওয়া ডাক্তার?

হা। তোমরা?

হরিরামপুরের অছিমদ্দি আর হাগুরা খাও।

ছাওয়া ভাল আছে তোমার?

এককোণা আসেন না কেনে হামার বাড়ি? ছাওয়াক দেখি যাইবেন। গুয়া পানও খাইবেন। অছিমদ্দির ছেলেটা কৃমিতে ভারী কষ্ট পাচ্ছিল। তার ওপরে ম্যালেরিয়া তো আছেই। এক বাঁক পরেই তার বাড়ি। এত কাছে যখন একবার দেখে গেলে হয়। সাইকেল ফেরাল ইদ্রিস। জাম গাছের সঙ্গে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রাখল সে। বলল, তাড়াতাড়ি করো ভাই অছিমদ্দি। অছিমদ্দি ভেতরে যাবার পরেই ভেতর থেকে তার কুদ্ধ গলা শোনা গেল। আর পরক্ষণে প্রহারের আওয়াজ। অছিমদ্দির ছেলেটা কেঁদে কঁকিয়ে উঠল।

ডিবে এক হাতে, আরেক হাতে ছেলেটাকে টানতে টানতে অছিমদ্দি এলো সামনে।

ব্যাপার কী?

কন কেনে ডাক্তারের ঘর। মুই মানা করি গেছং গুড় খাবু না, আসি দ্যাঁহো গুড় খাবার নাইগছে জানোয়ার কোন্টেকার।

ইদ্রিসই মানা করেছিল ছেলেটাকে মিষ্টি কিছু দিতে। সে বলল, আহা ছেলেমানুষ তো। ছাওয়া পোওয়াক তাই বুলি মারেন তোমরা?

ডিবেটা ধরে শিউরে উঠল ইদ্রিস। ছেলেটার চোখ কংকালের মতো ভেতরে বসে গেছে। কালি পড়েছে। বুকের সবকটা হাড় গোনা যাচ্ছে। ঝুলে পড়েছে ঢাকের মতো পেটটা। কোমরে ঘুনসি ছাড়া পরনে আর কিছু নেই। শেষ যখন দেখেছিল প্লীহাটা তখনো এত বড় ছিল না। ছেলেটা তখনো ফুলে ফুলে উঠছে কান্নায়। ঠোঁট গাল দুহাত চটচট করছে আখের গুড়ের রসে।

পেটটা একবার টিপে দেখল তার। নাড়ি দেখল। কিছু জিজ্ঞেসাবাদ করল। তারপর বলল, কাল ডিস্পেন্সরীতে আসেন তোমরা। ওষুধ দেমো ভাল দেখি।

যান কোটে? গুয়া পান মুখোৎ দিয়া যান।

পেছন থেকে অছিমদ্দি ডাকে। কিন্তু সে আর থামে না। অন্য সময় হলে হয়ত দুদণ্ড দাঁড়াতো। আজ ছেলেটাকে দেখেই তার মনে হয়েছে, বাঁচবে না। এ রকম একটা দুধের শিশু মারা যাবে, ভাবতেই ভেতরটা শিউরে উঠেছে তার। এক মুহূর্ত আর দাঁড়াতে পারেনি সে।

কাঁচা সড়ক দিয়ে সাইকেল চালিয়ে ফিরতে ফিরতে তার মনে পড়ে গেল বড় ভাইয়ের কথা। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই কুড়িটা টাকা সে মনিঅর্ডার করে দিয়েছিল। লিখেছিল, বড় ভাই যেন একজোড়া ভালো জুতো কিনে নেন, আর মাকে একটা মখমলের জায়নামাজ কিনে দেন। কুপনটা ফেরৎ এসেছে অনেকদিন। কিন্তু কোনো চিঠি পায় নি সে। বড় ভাইও দেন নি, মাও না। মা তো লিখতেই জানেন না। বড় ভাই যদি লিখে না দেন তো মার হাত পা বাঁধা।

বড় ভাই বোধহয় এখনো তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। দোষ তো তারই। তবু ইদ্রিস সব ভুলে গিয়েছে। পতিদহে এসেই চিঠি দিয়েছে এমনভাবে যেন দুভায়ে কোনোদিনই কিছু হয় নি, আগের মতোই সদ্ভাব আছে। সে চিঠির উত্তরও পায় নি সে।

খুব দুঃখ হলো ইদ্রিসের। ছেলেবেলায় একবার তার জ্বর হয়েছিল, বড় ভাই সারারাত জেগে মাথায় পানি দিয়েছিল তার। সে ভাই বুঝি মারা গেছে। আর কোনোদিন তার দেখা পাবে না সে।

যা কিছু হয়ে গেছে, তার জন্যে তো সে দেশ ছেড়েই চলে এসেছে। এখনো যদি সে কথা মনে রাখেন বড় ভাই, তাহলে অবিচার করা হয়।

ইদ্রিসের ইচ্ছে হয়, বড় ভাই যদি গোঁয়ারতুমি না করে কোনো একটা কাজকর্ম ধরতেন! আজকাল ইংরেজি লেখাপড়া না জানলে বড় হওয়া যায় না। তাই নিজে জেদ ধরে বড় ভাইকে টেনে নিয়ে এসেছিল সে ইংরেজি, ইস্কুলে। কিন্তু কিছুই লাভ হলো না শেষ অবধি। ইদ্রিস মনে মনে ভাবে, সে যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, একটু গুছিয়ে নিতে

পারে, তাহলে বড় ভাইকে নিয়ে আসবে দেশ থেকে। আর কিছু না হোক, হোমিওপ্যাথি শিখতে বলবে তাঁকে। দেশে ডাক্তারের বড় অভাব। ইদ্রিস একা বড় হতে চায় না, সে যদি বড় হবে তো বড় ভাইকে সঙ্গে নিয়েই হবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে ঘরে এসে পৌঁছে ইদ্রিস। দেখে মৌলবি সাহেব আর বছির কথা বলছে। তাকে দেখেই মৌলবি সাহেব দৌড়ে এলেন। বললেন, আইলেননি ভাই ছাব!

দেখছেনই তো।

এক কাম হই গেছে।

মৌলবি সাহেবের চোখ চকচক করতে থাকে। কানের কাছে মুখ এনে বলেন, বুবুজানেরে জ্বীনে ধইচ্ছে।

তাকে উপেক্ষা করে ইদ্রিস বছিরকে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে রে?

যা শোনা গেল তা এই সন্ধ্যের সময় ওজু করতে পুকুর ঘাটে গিয়েছিল হাজি সাহেবের ভাগনি আয়েশা বিবি। সেখানে কী হয়েছে কেউ বলতে পারে না। এক ঝি গিয়ে দেখে দাঁত কপাটি লেগে ঘাটের ওপর পড়ে আছে আয়েশা। তাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হয়েছে ভেতরে। মাথায় পানি ঢালা হয়েছে। জ্ঞানও ফিরে এসেছে। কিন্তু মানুষ চিনতে পারছে না। ভুল বকছে। থেকে থেকে চিৎকার করে উঠছে। তারপর আবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো। যাচ্ছে। এদিকে হাজি সাহেব বাড়িতে নেই। তিনি দুদিন হলো সদরে গেছেন কী একটা কাজে।

হাজি সাহেবের স্ত্রী ইদ্রিসকে ডেকে পাঠাতে বলেছিলেন। বছির এসে দেখে, ইদ্রিস রোগী দেখতে বেরিয়ে গেছে। সেই থেকে বাড়ির সবাই পথ চেয়ে তার জন্যে। এক্ষুণি তাকে ওষুধ দিতে হবে।

ইদ্রিস বলে, চল বাবা, দেখি কী হয়েছে।

সাইকেল রেখে সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াল ইদ্রিস। মৌলবি সাহেব সঙ্গী হলেন। বলতে লাগলেন, দাওয়াইর কাম ন ডাক্তার ছাব। আঁই ভালা দোয়া জানি, আঁই কই পারি, দোয়া পড়ি ঝাড়ি দিলে ভালা হই যাইতো।

অন্দর মহলের বার দরোজায় এসে থামলো ইদ্রিস। বছির ভেতর থেকে এক চট্‌কা ঘুরে এসেই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল অন্দরে। বসবার ঘরে চেয়ার টেনে দিল তাকে। মৌলবি সাহেব নিজেই একটা আসন টেনে বসে পড়লেন।

ভেতরে এর আগে আর কখনো আসেনি ইদ্রিস। চোখ যেন জুড়িয়ে গেল তার। মেহগিনি কাঠের কী সুন্দর নকশা তোলা সব আসবাব! গালিচা বিছানো। দেয়ালে বাঁধানো ফটোগ্রাফ। এক পাশে লেখাপড়ার টেবিল। মোটা মোটা বই তাতে সাজানো। মাথার ওপরে জ্বলছে ঝকঝকে চোদ্দ ল্যাম্প।

হাজি সাহেবের স্ত্রী পর্দার ওপাশে এসে দাঁড়ালেন। কথা হতে লাগল বছিরের মারফৎ। নতুন কোনো তথ্য পাওয়া গেল না। বছির আগে যা বলেছিল তাই আরেকবার বললেন উনি। ইদ্রিস বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না। মানে

ইতস্তত করল সে। সে যা বলতে চাইছিল তা হচ্ছে, রোগিনীকে একবার দেখা দরকার। কিন্তু কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা তা বুঝতে পারছিল না। এতদিন সে আছে এখানে, মনে হয় এরা পর্দা মানেন ষোলআনা। পর পুরুষকে ঘরের মেয়ে দেখতে দেবে না।

এদিকে মৌলবি সাহেব সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। তিনি আম্মা বলে এক লম্বা হাঁক পেড়ে নিবেদন করলেন, ডাক্তারের ওষুধ তারা নিতে পারেন, কিন্তু রোগিনী ভালো হবে না। কারণ, তিনি স্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন, জ্বীন আছর করেছে। জ্বীনের দাওয়াই আল্লার কালাম। বুবুজানের হাল শুনেই তিনি ছুটে এসেছেন। এখন যদি তারা অনুমতি করেন তো তিনি গিয়ে। ঝাঁড়ফুক করতে পারেন। সবশেষে তিনি আরেকবার বললেন, এবং বেশ জোরের সঙ্গেই, ওষুধে কিছু কাজ হবে না।

অন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা হাজি সাহেবের স্ত্রীর মনোভাব চট করে বাইরে থেকে টের পাওয়া গেল না। ইদ্রিস এটুকু অনুভব করতে লাগল। এর প্রতিবাদ করা দরকার। কিন্তু হাজি সাহেবের স্ত্রী কী বলেন সেটা আগে শোনা ভালো।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন দুপক্ষ।

মৌলবি সাহেব আবার হাঁক দিয়ে উঠলেন, আম্মা। ইয়ে জরুর জ্বীন কা কাম হ্যাঁয়। আপ বড়া দেখকে তামাকা এক বর্তন লাইয়ে পানি ভরকে। হাম দো মিনিট মে জ্বীন কো ভাগ্যা দেবতা হু।

আর বছিরকে বললেন, খাড়া খাড়া কেয়া দেখতা হ্যয়? জলজি করো।

ইদ্রিসের গোড়া থেকেই খারাপ লাগছিল বিনা আমন্ত্রণে মৌলবি সাহেবের অন্দর মহলে ঢোকাটা। তার ওপরে তার মুখে উর্দু শুনে তার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। সে বছিরকে বলল, আম্মা হুজুরাণীকে বলো যদি ঝাড়ফুক করাতে হয় তো আমি চলি। মৌলবি সাহেব রইলেন। বছির নিবেদন করে জবাব শুনে এলো। বলল, তোমরাও থাকেন ডাক্তারের ঘর। আম্মা কইলে, ডাক্তারের থাকা যাইবে।

ইদ্রিস বুঝতে পারল, ঝাড়ফুকটাই ভালো মনে করছেন হাজি সাহেবের স্ত্রী। তাকে থাকতে বলা শুধু ভদ্রতার খাতিরে। সে উঠে দাঁড়াল। বলল, না বছির, আমি রোগী দেখে ফিরেছি বহুদূর থেকে। ঘরে যাচ্ছি। দরকার হলে খবর দিও। আমাকে একটু পথ দেখাও বাবা। ভেতর থেকে শাড়ির খসখস চুড়ির রিনিঝিনি উঠলো। মৌলবি সাহেব ঠোঁট ফোলানো হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন ইদ্রিসের দিকে। ইদ্রিস বেরিয়ে এলো।

বার দরোজায় দাঁড়িয়ে পড়ে বছিরকে সে বলল, মৌলবি সাহেবকে আগে ডাকলেই পারতি। আমার জন্যে রাত দুপুর করার কী দরকার ছিল?

মুই কী জানো।

আচ্ছা যা, তোকে আর কী বলব। ভাত দিয়েছিস?

আছে তোমার ঘরৎ।

ইদ্রিস মাঠটা লম্বা লম্বা পায়ে অতিক্রম করে এসে হাত মুখ ভালো করে ধুলো। মাথায় পানি দিল। পানি পড়তেই ভারী আরাম লাগলো তার। একটু কষ্ট হলো আয়েশার জন্যে, সেই না দেখা তরুণীর জন্যে, যে তাকে একদিন দুধ পাঠিয়ে দিয়েছিল শরীর খারাপ শুনে। এতক্ষণে মৌলবি তার কেরামতি দেখাতে শুরু করেছে নিশ্চয়ই।

আয়েশার কথা বারবার মনে হচ্ছিল তার। তাকে সে চোখে দেখেনি কখনো। আয়েশা তার কাছে শুধু একটা নাম। এখন যেন সেই নামটাকে অবলম্বন করে অস্পষ্ট একটা মূর্তি গড়ে উঠতে লাগল। হাজি জয়েনউদ্দিন সুপুরুষ। তাঁর ভাগনি নিশ্চয়ই দেখতে সুন্দরী হবে। একবার বিয়ে হয়েছিল শুনেছে ইদ্রিস। তালাক হয়ে গেছে। কেন হয়েছে? বছিরের কাছ থেকে স্পষ্ট কিছু জানা যায় নি। আর তারও এর আগে তেমন কৌতূহল কিছু ছিল না।

ঘুম আসে না ইদ্রিসের।

মৌলবি সাহেব অন্দর থেকে এখনো ফেরেন নি। রাত কত হলো! বছির যদি একবার আসতো তাহলে ভেতরের সংবাদ জানা সেত। সে থেকে গেলেই পারত অন্দর বাড়িতে। তাতে অন্তত এই অস্বস্তি ভোগ করতে হতো না।

বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে অন্ধকারে হাঁটতে লাগল ইদ্রিস। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। কনকন করছে উত্তুরে হাওয়া। গায়ে কাঁপন উঠছে। ভেতর থেকে চাঁদর এনে গায়ে জড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইদ্রিস এলো কাঁচারি বাড়ির বারান্দায়। চৌকিদার ঘুমিয়ে আছে একটা হেলনা বেঞ্চে পা গুটিয়ে হাতের ওপরে মাথা রেখে। পরে পরে আরও কয়েকটা

বেঞ্চ। অতিথ পথিক রায়ত এলে বসে এখানে। দিনের বেলায় ভারী সরগরম হয়ে থাকে বারান্দাটা।

ইদ্রিস একটা বেঞ্চের দিকে লক্ষ্য করে এগুতেই কিসের সঙ্গে হোঁচট খেল প্রচণ্ড। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা টনটন করে উঠলো। ইস। বেঞ্চের ওপর বসে পায়ে হাত বুলোতে লাগল সে।

হঠাৎ মনে পড়ল, সে যখন বিয়ে করতে যাচ্ছিল হোঁচট খেয়েছিল এমনি। খুব দূরে কেউ ডেকে উঠল। শীতে এখানে কখনো কখনো বাঘ দেখা যায়। কান পাতল ইদ্রিস। অনেকক্ষণ পর ফেউটা আবার ডাকলো। মনের মধ্যে কেমন ভয় ভয় করল একবার। তবু সে বসে রইল সেখানে।

মা তাকে বলেছিলেন, শুভ কাজে বাধা পড়ল, একটু দাঁড়িয়ে যা।

আগে এই সব কথা মনে করে ভারী রাগ হতো তার। একটা কিছু প্রতিশোধ নেবার জন্যে নিসপিস করত হাতটা। পতিদহে এসে অবধি সে ভাবটা কী করে যেন কেটে গেছে। আজ সন্ধ্যেই তার মন কাঁদছিল বড় ভাইয়ের জন্য। দুঃখ হচ্ছিল তিনি একটা চিঠি দিলেন না বলে। গল্পের মতো মনে হয় সব।

ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিয়ে শিবালয়ে পৌঁছুতে হবে। শিবালয় থেকে গয়নার নৌকোয় রহিমগঞ্জ। রহিমগঞ্জে সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে ইদ্রিসের। বরযাত্রী বলতে বড় ভাই আর চাচা মিয়া।

চাচা মিয়া পথঘাট চেনেন। জানেন গয়নার নৌকো কখন ছাড়ে। শিবালয়ে এসে ভোর হলো। সারি সারি মিষ্টির দোকান আছে ঘাটে। সেখানে পেট পুরে মিষ্টি খেল ওরা। ইদ্রিস ভাল করে কিছু খেতে পারল না। হাজার হোক, বিয়ে করতে যাচ্ছে। মনের মধ্যে একটা কী হয় কী হয় ভাব। পাকস্থলী একেবারে কঠিন হয়ে আছে উদ্বেগে।

আগ বাড়িয়ে নেবার জন্যে শিবালয়ে লোক আসার কথা ছিল। কিন্তু তার দেখা পাওয়া গেল না। চাচা মিয়া অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন তাকে। বাজারের কয়েকটা দোকানে জিগ্যেসাবাদ পর্যন্ত করলেন। কিন্তু কোনো সন্ধানই মিলল না।

কেমুন কথা বাজান।

চাচা মিয়া চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

আমরাই রওয়ানা দেই গা। কইছিল লোক পাঠাইবো। অবশ্য সঠিক কইরা কিছু কয় নাই। আল্লা ভরসা। দেরি করমু না আর। আসো। রহিমগঞ্জে কোন্ গয়না যায় গো?

পারে দাঁড়িয়ে চাচা হাঁক পাড়েন।

এক নাও থেকে মাঝিরা আওয়াজ দেয়, আসেন, এই নায়ে আসেন। তারপর ভালো করে এক মাঝি নিরিখ করে তাদের। বলে, মিয়া সাবরা রহিমগঞ্জে কার বাড়িতে যাইবেন?

ক্যান, তা দিয়া কী দরকার?

না, জিগাইলাম। বরযাত্রী মনে অয়।

তাই বাপু।

তাইলে আসেন। আপনাগো লইয়া যওনের লিগা এক ব্যাটা আইছিল। কাইল রাইত ভরা নায়ে বইসা গাঞ্জা টানছে। আহেন, এই নায়েই বেহুঁশ অইয়া পইড়া আছে হে।

কও কী?

মাঝিরা দাঁত বের করে হাসে। খুব মজা পেয়েছে তারা। বিয়ের বরকে আগু বাড়িয়ে নিতে এসে গাঁজা টেনে চিৎ হয়ে আছে, আর ওদিকে বর ঘুরছে বোকা বলদের মতো।

আহেন, আহেন মিয়া সাবরা।

কাণ্ড দেখে তো বড় ভাই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

শালার এরা ভদ্রলোকই না। গাঁজাখোররে পাঠায় ভদ্রলোক হলে? কেমুন জাগায় সম্বন্ধ করছেন চাচা মিয়া।

ন্যাও বাপু আর দিক কইরো না। ভালো খারাপ দুই জাত নিয়াই দুনিয়া। হের তুমি করবা কী?

বেলা তিনটে নাগাদ নাও এসে ভিড়ল রহিমগঞ্জের ঘাটে। না এখানে কোনো ত্রুটি নেই অভ্যর্থনার। নৌকো থেকেই দেখা যাচ্ছিল পাড়ে কয়েকজন প্রৌঢ় এক পাল ছেলে নিয়ে

দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের সবার পরনে পরিষ্কার করে কাঁচা কাপড়, মাথায় টুপি, পায়ে পাম্পশু। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল বর নিতে এসেছে তারা।

তাদের ভেতরে একজনকে চাচা মিয়া চিনলেন। নৌকো থেকেই সালাম বিনিময় হলো। সালামালাইকুম।

অন্যান্য যাত্রীরা নেমে যাবার পর কলিদার টুপি পরা লোকটা পাড় থেকে নৌকোয় উঠে বড় ভাইর হাত ধরে বললে, আসেন।

চাচা মিয়া তড়বড় করে বলে উঠলেন, আরে, হে জামাই না। জামাই ইনি। আর ইনি জামাইর বড় ভাই।

অপ্রস্তুত হয়ে লোকটা বলল, ঐ এ্যাক কথাই অইলো।

ঘাট থেকে কয়েক রশি পরেই বাড়িটা। হেঁটেই চলল সকলে। লোকটা দুঃখ করতে লাগল, বুছ লাইন ভাই সাব। গায়ের সে অবস্থাও নাই, জলুসও নাই। আগে তিন তিনখান পালকি আছিল। এহন একখানও পাইবেন না। বহুৎ কোশিস করছি পালকির জইন্যে। মাফ কইরা দিয়েন।

বাংলা ঘরটাকে সাজানো হয়েছে বিয়ের জন্যে। ঘর থেকে সব কিছু বের করে সারা মেঝে জুড়ে ধবধবে ফরাস পেতে দেয়া হয়েছে। তার মাঝখানে মখমলের জায়নামাজ বিছানো। সেখানে হাত ধরে বসানো হলো ইদ্রিসকে। শরবৎ এলো, পাখা এলো। ভেতর থেকে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল বৌ ঝিয়েরা।

একটু পরে লোকটা এসে খবর দিল, গোসল করনের ব্যবস্থা অইছে। দামাদ মিয়া আসেন। আপনেরাও চলেন।

গোসল করে পোর্টম্যান্টো খুলে আচকান পাজামা বের করে পরল ইদ্রিস। বড় ভাই মাথায় বাঁধলেন দশ প্যাঁচের পাগড়ি। চোখে ঘন করে সুরমা দিলেন। যুবক দরবেশের মতো ধবধব করতে লাগল তার চেহারা। ছবিটা ইদ্রিসের চোখে এখনো লেগে রয়েছে।

বাংলা ঘরের পাশে এই ঘরটা বরযাত্রী দুজনের জন্যে। সেখানেই কাপড় বদলানো হচ্ছিল। চাচা মিয়া বললেন, ইদ্রিস তুমি বসো বাজান আমরা ঘুরনা দিয়া আসি।

আধ ঘণ্টার মতো একা ছিল ইদ্রিস! ঠিক একা বলা যায় না বাড়ির কিছু ছেলেপুলে ঘিরে রেখেছিল তাকে। গলা জড়াজড়ি করে তাকে দেখছিল ওরা বড় বড় চোখে। ইদ্রিস দুএকজনের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সুবিধে হয় নি।

ইদ্রিসের পরে মনে হয়েছে, ঐ আধঘণ্টা যে বড় ভাই আর চাচা মিয়া বাইরে ছিলেন, কথাটা হয়েছে তখনই।

আধঘণ্টা পরেই সেই কল্লিদার টুপি পরা লোকটার সঙ্গে এলেন চাচা মিয়া। বড় ভাইকে দেখা গেল না।

তারা দুজন এসে ইদ্রিসের দুদিকে বসলেন চৌকির পরে। লোকটা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে কৌতুককণ্ঠে বলল, কী রে পোলাপান, দুলা পছন্দ অইছে?

হি হি করে হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে আর কী!

যাহ, ভাগ এহান থনে। শীগগীর বাইরা। গেলি!

হুড়মুড় করে ছেলেদের দল চলে গেল। একটু পরে আরো কয়েকজন মুরুব্বি এসে সমস্বরে সালাম আলাইকুম দিয়ে বসে গেলেন চৌকির ওপর। চৌকিতে মানুষ আর ধরে না।

সদালাপ হলো খানিকক্ষণ। তারপর এক প্রৌঢ় এক বুড়োকে ঠেলা দিয়ে বললেন, কথাডা কইয়া ফালান চাচা। সময় নষ্ট কইরা লাভ কী?

চমকে উঠল ইদ্রিস। বিয়ের বর, মাথা তুলতে নেই। মাথা নিচু করেই সে রইলো। কিন্তু কানটা সজাগ হয়ে উঠলো, কঠিন হয়ে এলো হাত পা। কী কথা বলতে এসেছেন ওরা?

অনেকক্ষণ কেউ কিছু বললেন না। থমথম করতে লাগল ঘর। সবাই অস্বস্তিতে উসখুস করতে লাগলেন।

অবশেষে একজন বললেন, দুলামিয়া, আমরা দশজনে আপনের কাছে একড়া কথা কইবার চাই। কথাডা কিছু না। দ্যাহেন, হায়াত মউত রিজিক দৌলত আল্লার হাতে। বিয়ে শাদি যার। যেহানে লেখা আছে আল্লার খাতায়, আল্লা ভিন্ন কেউ তারে খণ্ডাতি পারে না। তা আপনে। এই বাড়ির দুলাহ্ অইবেন। আমরা কিন্তুক, খালি আপনেরে না, আপনের মিয়া ভাইরেও দুলাহ্ কইরা রাইখতে চাই।

অবাক হয়ে ইদ্রিস তাকাল চাচা মিয়ার দিকে।

চাচা মিয়া মাথা নামিয়ে নিলেন।

মুরুব্বিদের আরেকজন বললেন, কথাডা ভাইঙ্গাই কওনা ছোট মিয়া। দুলামিয়া শিক্ষিত লেহাপড়ি জানা মানুষ, হে খুশিই অইবো শুইনা। দুই ভাই এক জোটে দুই বৌ নিয়া দ্যাশে যাবি অ্যারচে খুশির কথা আর কী অইবার পারে!

ইদ্রিস নিচু গলায় চাচাকে জিজ্ঞেস করল, মিয়া ভাই কেনে? এনারা কইতাছেন কী?

চাচা মাথা নিচু রেখেই কম্পিত গলায় বললেন, আমি কিছু জানি না ইদ্রিস। আমার মতই আছিল না। কিন্তু হঠাৎ এই কথা হইয়া গেল। এহন কী করি? তুমিই কও। বিয়া না কইরা যদি ঘরে যাও মাইনষে ছি ছি কইরবে, ছ্যাব দিবে, তোমার মায়ে যে কী কইরা বইসবে তা আল্লাই জানে।

এসব কথার একবর্ণ ইদ্রিসর বোধগম্য হলো না। সব অসম্বন্ধ; অসম্ভব বলে মনে হলো তার। বড় ভাইকে এরা দুলাহ্ করতে চায় অর্থ কী? এই তো সেদিন পর্যন্ত তাকে কত বোঝানো হলো তিনি রাজি হলেন না। এখন হঠাৎ কিসের গুণে কী হয়ে গেল?

অবশেষে সব কথাই প্রকাশ পেল। যে বাড়িতে ইদ্রিস বিয়ে করতে এসেছে সে বাড়িতে দুই মেয়ে। বাপ নাই, মা আছে। দুঃখে কষ্টে সংসার চলে। বড় মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে ইদ্রিসের। এখন গাঁয়ের লোক বড় ভাইকে দেখে এবং তিনি অবিবাহিত

শুনে ঠিক করেছে বড় মেয়ের সঙ্গে বড় ভাইয়ের আর ছোট মেয়ের সঙ্গে ইদ্রিসের বিয়ে দেবে তারা।

শুনে হতভম্ব হয়ে গেল ইদ্রিস। কী বলবে, কী করবে, কী করা উচিত কিছু বুঝতে পারল না সে। চাচা মিয়া কফ ফেলার নাম করে কাশতে কাশতে বাইরে চলে গেলেন। গাঁয়ের মুরুব্বিরা হাত চেপে ধরলো ইদ্রিসের—- তাদের কথা তাকে রাখতেই হবে। এদের বাপ নাই। জানেনই তো, দুঃখের সংসার। দুই মেয়ের বিয়ে এক সঙ্গে হয়ে গেলে ঝামেলা যায়। তাছাড়া এই বিয়েতে যে খরচ হচ্ছে তা জোগাতেই মেয়ের মা প্রায় সর্বস্ব বাধা দিয়েছেন। ডাক্তার দুলা বলেই কোন দিকে তাকান নি তিনি। এখন ইদ্রিসেরও তো এ বাড়ির জামাই হিসেবে দায়িত্ব একটা হবে, শালীকে বিয়ে দিতে হবে নিজের খরচে। তার চেয়ে এই ব্যবস্থাই ভালো নয় কি? দুই ভাই দুই বোন। বোনে বোনে ভাইয়ে ভাইয়ে ছাড়াছাড়ি নেই। এক সংসারে গলাগলি হয়ে থাকবে। এর চেয়ে সুখের আর কী হতে পারে?

ইদ্রিস কিছু বলল না। পাথর হয়ে বসে রইলো।

কয়েকজন উঠে দাঁড়াল। তাদের ভেতরে একজন বলল, তাইলে সুখবরটা দিয়া দেইগা মজলিশে।

হাজার চেষ্টা করেও ইদ্রিস নিজের কণ্ঠে একটি ধ্বনিও ফোঁটাতে পারল না। জীবনে এত বড় বিস্ময় তার হয় নি।

অভিভূতের মতো বিয়ের মজলিশে গিয়ে বসলো সে। প্রথমে বড় ভাইয়ের বিয়ে পড়ানো হলো। তারপর তার। আলহামদুলিল্লাহর মিলিত ধ্বনিতে বারবার মুখরিত হয়ে উঠল মজলিশ। গোলাপপাশ থেকে গোলাপজলের ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গেল একবার। মিছরির টুকরো হাতে হাতে ফিরতে লাগল।

ইদ্রিসের শুধু দুটি কথাই মনে হয়েছিল। আর সে কথা দুটিই তাকে দুর্বল করে ফেলেছিল। বড় ভাই বাপের অবর্তমানে বাপের মতো–তার ইচ্ছে মান্য করা ছোট ভাইয়ের কর্তব্য। আর মনে হয়েছিল, তাদের বংশে কেউ কখনো বিয়ে করতে এসে ফিরে যায় নি।

চাচা যখন পাত্রী খুঁজতে বেড়িয়েছিলেন, জিজ্ঞেস করেছিলেন ইদ্রিসকে, তার কিছু বক্তব্য আছে কিনা। উত্তরে ইদ্রিস বলেছিল, আমি টাকা পয়সা চাই না, বড় ঘরও চাই না, তবে মেয়ে যেন সুন্দরী হয়।

রহিমগঞ্জ থেকে ফিরে গিয়ে চাচা বলেছিলেন, পাত্রী যা দেইখা আসছি একশ জনের মইধ্যে একজন। যেমুন রং তেমুন চেহারা। দেইখলে ইরানি বুইলা ধন্দ হয়। পান খাইলে গলা দিয়া পানের পিক নাইমতে দেখা যায়। আর কী চাও?

ইদ্রিস ধরেই নিয়েছিল ছোট বোনও তেমনি সুন্দরী হবে।

বাসর ঘরে ঢুকে দেখে লাল শাড়ি জড়ানো ছোট্ট পুঁটুলির মতো একটা বাচ্চা মেয়ে পড়ে আছে। এ যে একবারে সাত বছরের বালিকা! একে তো সে আশা করে নি। দপ করে আগুন ধরে গেল মাথার ভেতরে। এক হাতে মুখটা তুলে দেখেই আর্তনাদ করে পিছিয়ে

এলো ইদ্রিস। কোথায় দুধে আলতা রং, আর কোথায় ছবির মতো চেহারা, ঘোর শ্যামবর্ণ, ঠোঁট পুরু, নাক খাটো, কপাল উঁচু তার।

দুই বোনে এত পার্থক্যও হয়?

গুম হয়ে বসে রইলো সে সারারাত। না, চৌকিতে না। ঘরের কোণে জলচৌকি ছিল একটা তাতে।

পরদিন ভোরে কাক ডাকার আগে বেরিয়ে পড়ল ইদ্রিস। সঙ্গে কিছু টাকা ছিল। ঘাটে এসে শুনলো গয়নার নৌকো ছাড়বে বেলা এক পহর হলে। একটা ছোট্ট নৌকা এক টাকায় ভাড়া। করে এলো শিবালয়। সেখান থেকে গোয়ালন্দ হয়ে কলকাতা। কলকাতায় নেবে সোজা প্রিন্সিপাল খানের কাছে। মাকে একটা চিঠি দিয়েছিল পরদিন। কিন্তু গায়ে ফিরে যায় নি। পতিদহে আসবার আগে পর্যন্ত মায়ের কাছে দ্বিতীয় চিঠিও লেখেনি সে। পতিদহে কাছারি বাড়ির বারান্দায় রাত দুপুরে অতীত পরিক্রম করে এলো ইদ্রিস ডাক্তার। কার কপালে কী। লেখা আছে কেউ বলতে পারে না। কোথায় পতিদহ, ইহজীবনে এখানে আসা দূরে থাক নাম। পর্যন্ত জানার কথা নয়। অথচ পতিদহই এখন তার কাছে একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র সত্য হয়ে উঠেছে।

বারান্দা থেকে নেমে এসে আবার হাঁটতে লাগল ইদ্রিস। নাহ্, শীত জোর পড়েছে। চাঁদর টেনে কানমুড়ি দিল সে। ভারী ক্লান্ত লাগছে শরীরটা। চোখ জড়িয়ে আসছে। এবার বোধহয় ঘুম আসবে।

হঠাৎ রাতের অন্ধকার যেন খানখান হয়ে গেল নারী কণ্ঠের চিৎকারে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ইদ্রিস। কান থেকে নামিয়ে দিল চাঁদর। তারপর প্রায় দৌড়ে অন্দর মহলের বার দরোজায় এসে চিৎকার করে ডাকল, বছির, বছির।

সঙ্গে সঙ্গে বছির এসে তার গায়ের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বলল, কই ডাকেন? তোমরাই? মুই তোমার আগোৎ যাবার ধরছিনু। আম্মা তোমাক বোলায়।

কেনে? তোমার বুবুজান চিরি উঠিল কেনে?

কাঁই কবার পায়। আইসেন তোমরা। ওমরা কত ঝাড়ন ঝাড়িল, কিছুই হইল না। বুবু আরো দাপেয়া ওঠে থাকি থাকি।

আয়েশার চিৎকারটা যেন তখনো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারিদিকে। ইদ্রিস বলে, চল দেখছি।

ভেতরে এসে দেখে মৌলবি সাহেব গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। তার দিকে দ্বিতীয় বার আর তাকাল না ইদ্রিস। বছিরকে বলল, খবর দে। মুই রোগী দেখি। ফির ওষুধ দিম্।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ভেতরে ডাক পড়ল তার। প্রকাণ্ড উঠোন পেরিয়ে পুবের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। ঢুকে দেখে বিছানার ওপর এক তরুণীকে ঘিরে কয়েকজন বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন। তরুণী আপাতত সঙ্গাহীন। মেঝের ওপরে পানি ভর্তি তামার ডেক রয়েছে একটা। এক পাশে মাটির হাঁড়িতে খানিকটা আগুন তখনো ধিকিধিকি করে জ্বলছে, ধোঁয়া উঠছে। প্রথমেই সে বছিরকে বলল, এসব বাইরে নিয়ে যেতে! জানালাটা

খুলে দিতে। জানালা খুলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে গেল। ঘরের ভেতরে গুমোট ভাবটা কেটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল শীতল স্নিগ্ধতা।

ইদ্রিস প্রশ্ন করতে লাগল বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য না করে।

পুকুরঘাটে সঙ্গে কেউ গিয়েছিল?

বৃদ্ধাদের ভেতর একজন ইতস্তত করে উত্তর দিল,। এর পরে সে–ই মুখপাত্রী হিসেবে অন্যান্য প্রশ্নেরও উত্তর দিতে থাকল। সব শুনে ইদ্রিসের মনে হলো, আসলে ভয় পেয়েছে আয়েশা। সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকী পুকুরঘাটে একটা বেড়াল দেখেও ভয় পাওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

ইদ্রিস বলল, নাড়িটা দেখতে হবে।

ওরা একটু দূরে সরে দাঁড়াল।

আয়েশার হাত তুলে নিল ইদ্রিস। শরীরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়ে গেল তার। আর কোন দিন কোনো নারীকে স্পর্শ করে এরকম অনুভূতি তার হয় নি। শীতল, অবিশ্বাস্য কোমল, অসহায় একটি হাত। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, এমন রূপও মানুষের হয়! গোলাপের মতো অবিকল বর্ণ। ছিপছিপে নাক, সুগঠিত চিবুক, পাতলা ঠোঁট, দীর্ঘ গ্রীবা। ভরা একটা নদীর মতো স্বাস্থ্যের সম্ভার। ইতিহাসের বই পড়ে নূরজাহান, মমতাজমহল এদের ছবি যেমন কল্পনা করা যায়, ঠিক তেমনি। মোহগ্রস্তের মতো হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ইদ্রিস। চোখ ফেরাতে পারে না। অথচ সে চোখে যেন সে কিছু দেখতেও পাচ্ছে

না। যেন একখণ্ড স্বপ্নের সঙ্গে বেহেস্তের সঙ্গে আজ মধ্যরাতে তার হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেছে। পরমুহূর্তে গ্লানিতে ভরে উঠল তার মন। ছি, ছি, এ কী হলো তার। এ কেমন মন নিয়ে সে অসুস্থের শয্যা পাশে দাঁড়িয়ে আছে! সচকিত হয়ে উঠল তার শরীর। কঠিন হয়ে গেল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেছিলেন, মাতৃজ্ঞানে পর–রমণীর চিকিৎসা করবে। তা যদি না পারো তাহলে তার চিকিৎসাই কোরো না।

জীবনে এমন মতিভ্রম তার হয় নি।

ইদ্রিস সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কঠিন শাসন করে নাড়ি দেখল আয়েশার। অত্যন্ত ক্ষীণভাবে বইছে। বছিরকে থার্মোমিটার স্টেথসকোপ আনতে বলল। তুমুল জ্বরের ঘোরেই অচেতন হয়ে পড়ে আছে আয়েশা।

স্টেথসকোপ দিয়ে এবারে বুক দেখল তার।

সারাক্ষণ নিজের সঙ্গে প্রবল লড়াই চলতে লাগল ইদ্রিসের। এ রকম সমস্যায় জীবনে সে পড়ে নি। ডাক্তার হয়ে মাতৃজ্ঞানে নারীকে দেখতে পারছে না, এই সত্যটা ছুরির মতো তার বুকে বারবার বিদ্ধ হতে লাগল। সে বেরিয়ে এলো।

এসে ডিস্পেন্সরী খুলে ওষুধ পাঠিয়ে দিল বছিরের হাতে।

মৌলবি সাহেব একবার কী বলবার জন্যে কাছে এলেন। কিন্তু ইদ্রিসের কঠিন মুখভাব এবং চিন্তান্বিত ভ্রূকুটি দেখে সাহস পেলেন না।

ইদ্রিস এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

অন্ধকারে ভেতরের অস্থিরতা যেন শতগুণ হয়ে উঠল তার। কেবলি এপাশ ওপাশ করতে লাগল সে। একদিকে নিষিদ্ধ আকর্ষণ, আরেক দিকে চিকিৎসকের কর্তব্য। একবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল আয়েশার মুখ, শরীর; আরেকবার মনে পড়তে লাগল প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

লণ্ঠনের আলোয় মোহময়ী হয়ে উঠেছিল আয়েশা। অচেতন হয়ে পড়ে আছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ওপর নেই তাই শাসন বারণ। বৃদ্ধারা খানিকটা ঢেকেঢুকে দিয়েছিল বটে কিন্তু তাতে আরো রহস্য সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। চকিতে একটা শুভ্র গোড়ালি দেখা গিয়েছে। দেখেছে ফিকে গোলাপি আভা বাহুমূলের। ভেতরের সুপ্ত যন্ত্রণায় আর জ্বরের উত্তাপে বিযুক্ত হয়ে আছে দুই ঠোঁট একটা লীলায়িত ভঙ্গিতে কঠিন হয়ে আছে আয়েশা। বালিস ডুবিয়ে বিছানার ওপর ঢলে পড়েছে একরাশ কালো রেশমি চুল। নিটোল গালে নীল শিরা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল তার। একটি মাত্র মুহূর্ত। তার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল। আগুন জ্বলতে তো এক মুহূর্তের বেশি লাগে না। আর আগুন সবভুক। নীতি, আদর্শ, চেতনা, বিবেক সব সে পোড়ায় যেমন পোড়ায় কাঠ, মাংস, অরণ্য, মৃত্তিকা।

তার ব্যর্থ বাসরে এই এলায়িত যুবতাঁকেই সে কল্পনা করেছিল। সে রাতে যদি এমন হতো! সে রাতে যদি সাত বছরের কুশ্রী সেই বালিকার বদলে থাকত আয়েশা!

নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসে ইদ্রিসের। উপুড় হয়ে দুহাতে মাথা চেপে সে শান্ত হবার চেষ্টা করে। দূরে ফেউ ডেকে ওঠে আবার। অন্ধকার বিলে যেন ঢিল পড়েছে—-তরঙ্গ কাঁপতে কাঁপতে সুদূরে মিলায়, আবার ফিরে আসে, আবার মিলায়।

শরীরটাকে ঘুরিয়ে চিৎ হয়ে শোয় ইদ্রিস। উঠে বসে। না এ তার ভাবা উচিত নয়। অবাক হয়ে সে লক্ষ্য করে, এতক্ষণ যাকে এড়িয়ে চলেছে, তার হাতেই সে বন্দি। সে আয়েশার কথা ভাবছে।

আয়েশার কথা ভাবা তার উচিত নয়। আয়েশা তার রোগী, সে চিকিৎসক। যে নারীকে মাতৃজ্ঞান করতে না পারবে, তার চিকিৎসা কোরো না। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের ভ্রূকুটি স্পষ্ট দেখতে পায় ইদ্রিস। সে মনে মনে তওবা করে। এক থেকে একশ পর্যন্ত গোনে। আবার একশ থেকে উল্টো দিকে গুনতে গুনতে একে ফিরে আসে। অতীতে যখন তার মনে হয়েছে। নিজেকে শাসনে রাখতে পারছে না, চেতনা গুলিয়ে যাচ্ছে, সংকটে অবশ হয়ে যাচ্ছে চিন্তা, তখন এমনি সংখ্যা গণনা করে শান্তি পেয়েছে সে।

আজ সে সংখ্যা গণনা কোন কাজে এলো না।

জীবনে যে পূর্ণিমা সে কামনা করেছে, সে পূর্ণিমা কি এভাবে এলো?

এ পূর্ণিমা স্নিগ্ধ করে না, পোড়ায়। ছোবল দেয়। শরীর নীল করে দেয় বিষে।

ইদ্রিস একবার ভাবল, পতিদহ থেকে চলে যাবে সে। হাজি সাহেব ফিরে এলে পদত্যাগপত্র পেশ করবে তার কাছে। জীবনে এই প্রথমবারের মত পরাজিত মনে হয়

নিজেকে, ধিকৃত মনে হয়। এই ধিক্কার, এই পরাজয় বাইরের কেউ জানুক বা না জানুক তাতে কী? সে নিজে কী করে বহন করবে এই অপরিসীম গ্লানি। তাকে বড় হতে হবে, ছেলেবেলা থেকে এই কথাটা কানে শুনতে পেত নদীর স্রোতে, অরণ্যের মর্মরে, বাতাসের প্রবাহে। কিন্তু কীভাবে বড় হবে, সেটা আজো জানা হয় নি তার। আজ এই নিশুতি রাতে মনে হলো, সত্য যদি তার সঙ্গে থাকে, নিজের কাছে নিজেই যদি মাথা উঁচু করে থাকতে পারে তবেই সে বড়। তক্ষুণি উঠে সে বাতি জ্বালিয়ে পদত্যাগপত্র লিখল।

লেখার সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিতে ভরে উঠল মন। এতক্ষণ চাঁদর ছিল না গায়ে। তবু শীত করছিল না। এখন শরীরে আবার টের পেল বাতাসের স্পর্শ। গায়ে চাঁদর জড়িয়ে নিল ইদ্রিস। বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক দুরন্ত বাতাস কখন অস্থির করে তুলল তার পদত্যাগপত্র। এক সময়ে ঝটপট করে কাগজটা পড়ে গেল মেঝেয়। চৌকির নিচে ঘুমিয়ে থাকা বেড়ালটা সজাগ হয়ে তাকাল চারদিকে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কাগজটার পরে। তীক্ষ্ণ নখরে কুটিকুটি করে পদত্যাগপত্রটা ছিঁড়ে ফেলল লাওয়ারিশ ক্রুদ্ধ বেড়ালটা।

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ১৯৬২